# জেন্ডার, নারীর শরীর ও সংস্কৃতি

মাসুদুজ্জামান

সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত নারী-পুরুষের সম্পর্কই হলো জেন্ডার। কিন্তু কীভাবে এই সম্পর্ক নির্মিত হয়েছে, সেই নির্মাণের তাৎপর্যই-বা কী? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই প্রথমে নারীবাদ বা মানবীবিদ্যার বিকাশ ঘটে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণ হতে থাকে। পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান অধস্তন কেন, কীভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্মাণকে পালটে দিয়ে নারী-পুরুষের ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমানাধিকারধর্মী আধিপত্যহীন পরিবেশের সৃষ্টি করা যায়, সেই লক্ষ্যে নারীবাদীরা একদিকে যেমন পুরুষতন্ত্রকে আবিষ্কার ও আক্রমণ করেছেন, অন্যদিকে নারীর নিজের অবস্থানকে পুনর্নির্মাণ করে নিতে চেয়েছেন। নারীর অবস্থা নির্ণয় আর অবস্থান প্রতিষ্ঠার তাই একটি বড়ো ক্ষেত্র হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের অবস্থানের স্বরূপ কী, কীভাবে নারী সংস্কৃতিতে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করতে পারে, কীভাবে পুরুষ ও নারী সমানাধিকার আর মর্যাদা নিয়ে জীবন নির্বাহ করতে পারে, এসব দিকের প্রতি নারীবাদী লেখক আর মানবীবিদ্যা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা মনোযোগী হয়েছেন। আমার এই প্রবন্ধে আমি এসব দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করে নারীর সাংস্কৃতিক অবস্থানের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য আর এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করব।

মানবীবিদ্যাচর্চার ধারাক্রম লক্ষ করলে দেখা যাবে, ১৯৭০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্যের মানবীবিদ্যায় তাত্ত্বিকভাবে নারীবাদ ক্রমশ জেন্ডারের দিকে সরে আসতে থাকে। তাত্ত্বিক এই রূপান্তর, বলা বাহুল্য, সংস্কৃতির ব্যাখ্যা ও চর্চাকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। নারী-পুরুষের সাংস্কৃতিক অবস্থানের স্বরূপ কী, কীভাবে নারী সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, নারীবাদীদের নানা লেখায় আর গবেষণায় তার বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে মানবীবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। বিশ্বসংস্কৃতির বড়ো বড়ো নিদর্শনগুলোর পাশাপাশি নারীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দিকে নারীবাদীরা দৃষ্টি ফেরান, তাঁরা এক্ষেত্রে নারীর অবদান কতটুকু তা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। নারীবাদীরা এভাবেই নারীর প্রত্নতাত্ত্বিক ও বংশগত শিকড় অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন, নারীর অবস্থান ও অবদান এক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এর আগে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, যার মূলকথা ছিল নারী-পুরুষের পার্থক্যকে শনাক্ত করা, সেই বিতর্ক থেকে সরে এসে নারীবাদীরা নারীর সঙ্গে নারীর যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করেন। নারীবাদীরা এই সময় উল্লেখ করেন, নারীত্ব এক ধরনের নির্মাণ আর জেন্ডার হলো প্রকাশ (performance)। এরই সূত্র ধরে প্রকাশধর্মী সমস্ত শিল্প; যেমন চলচ্চিত্র, জনপ্রিয় সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম, ইত্যাদির প্রতি মানবীবিদ্যার লেখকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে মানবীবিদ্যার তাত্ত্বিক দিকটি আবার মানুষের শরীরকে কেন্দ্র করে বিপুলভাবে বিকশিত মানবপ্রযুক্তির (biotechnology) দিকে ঘুরে যায়। সংস্কৃতির আরো একটা বাঁক এই সময় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; আর তা হলো, মানুষের শরীর, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এসবের মধ্যেকার সম্পর্ক কী তার স্বরূপ উন্মোচনে সমাজবিজ্ঞানী, সংস্কৃতি সমীক্ষক, নারীবাদী সবাই মনোযোগী হয়ে ওঠেন। বিশ্বজুড়ে নারীঅধ্যয়ন আর জেন্ডারের প্রতিপাদ্য বিষয় এভাবেই বদলে যেতে থাকে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের দ্বারা বিভাজিত পৃথিবী এককেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, উদ্ভব ঘটে বিশ্বায়নের। বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে নতুন এক সাংস্কৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়, ভেঙে পড়ে বা রূপান্তরিত হয়ে যায় গণপরিসর (public sphere) আর ব্যক্তিক পরিসরের (private sphere) ক্ষেত্রগুলো। এই পরিসরের মধ্যেই ব্যক্তিমানুষের অবস্থান কী হবে এবং মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতির কোন ধরনের সাংঘর্ষিক ও সহাবস্থানমূলক পরিবেশের সৃষ্টি হবে— বিশ্বের সাংস্কৃতিক সমীক্ষক, লেখক, ভাবুকদের ভাবনার এখন এটাই মূল বিষয়। এ কারণে সহজেই বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে এই তাত্ত্বিক ভাবনাই বিশ্বজুড়ে প্রধান ভাবনা হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করবে। কিন্তু সমকালের এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে গত শতাব্দীর পটভূমিতে তা বুঝতে হবে।

গত শতাব্দী, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মূলকথা ছিল এটাই— সংস্কৃতি সরলভাবে বিকশিত হয় নি, লৈঙ্গিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। পুরো বিশ শতক ধরে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান নারীদের লেখাকে বিচার বিশ্লেষণ করে নারীলেখক বা নারীঅধ্যয়নকারীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মার্গারেট মিডের নৃতাত্ত্বিক রচনা, ভার্জিনিয়া উলফের সাহিত্য

সমালোচনামূলক লেখা, গারতুদ স্টেইনের রচনা, হান্না হচের লেখাকে এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাঁরা সবাই মূলত সংস্কৃতি লৈঙ্গিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বেগম সুফিয়া কামাল পর্যন্ত সংস্কৃতির নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নারী যে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে এসেছে সেকথা বলা যায় সহজেই।

নারীর সাংস্কৃতিক অবস্থা বোঝার জন্য পাশ্চাত্যের নারীবাদীরা সংস্কৃতির নানা প্রকাশের মধ্যে দুটি দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এর একটি হলো 'উঁচু সংস্কৃতি' (high culture), যেমন সাহিত্য, শিল্পকলা, নাটক ইত্যাদি; আরেকটি হলো নানা 'জনপ্রিয় সংস্কৃতি' (popular culture), যেমন চলচ্চিত্র, টেলিভিশনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, সোপঅপেরা ইত্যাদি। সংস্কৃতির এই দুই ধরনের প্রকাশের মধ্য দিয়েই মূলত নারী-পুরুষের সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্ণিত হয়েছে বলে নারীবাদীরা মনে করেন। আমি মূলত এসব সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক সম্পর্ক কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই প্রতিফলনের অর্থ কী, তাৎপর্য কী, সে-সবই এই প্রবন্ধে নির্ণয় করার চেষ্টা করব।

## দ্বৈতবিরোধের (binary opposition) শক্তি

গত শতকের সত্তরের দশকে নারীমুক্তি আন্দোলনের শক্তি হিসেবে যে ভাবনাটি কাজ করছিল, তা হলো, নারীও মানুষ। বিশ্বজুড়ে নারী সাংস্কৃতিকভাবেই পুরুষের অবদমন আর অধস্তনতার শিকার হয়েছে। এই তিক্ত অভিজ্ঞতাই মূলত নারীমুক্তি আন্দোলনের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছিল। এ আন্দোলনে নারী ও পুরুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যে সমতার কথা বলা হচ্ছিল, সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাই ছিল তার ভিত্তি। এই সময় নারীমুক্তির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় প্রধান হয়ে ওঠে : প্রথমত, নারী ও পুরুষকে সাংস্কৃতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবনাজগতে এই সাংস্কৃতিক বিভক্তির রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। পুরুষতন্ত্র এই একপেশে চিন্তা থেকেই নারীকে যুগ যুগ ধরে আলাদা চোখে দেখে আসার যুক্তি দাঁড় করিয়েছে। এভাবেই নারী হয়ে পড়েছে পুরুষের অধস্তন আর শিকার হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক নির্যাতনের (গ্রিমশ ১৯৮৬, লয়েড ১৯৮৪)।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে ওঠে, তা হলো, ভগ্নীত্বের (sisterhood) বিশ্বজনীন বোধ (মরগান ১৯৮৪)। এই বোধ থেকেই পশ্চিমে চরম নারীসমকামিতার (radicalism) সৃষ্টি হয়। নারীরা পুরুষের পাশাপাশি গণপরিসরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সামাজিক সংস্কার বিষয়ে তাঁরা যেমন সোচ্চার হন, তেমনি সামাজিক অগ্রগতিতে নারীর অবদানকে তাঁরা স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান। এই সময় নারীরা আসলে যে-কথাটা জোরের সঙ্গে বলতে চেয়েছেন, তা হলো, সর্বক্ষেত্রে তাঁদেরও পুরুষের সমান অধিকার, মর্যাদা আর স্বীকৃতি দিতে হবে; কোনো বৈষম্য করা চলবে না, অবহেলা তো নয়ই। মানবজগতের ঘরে-বাইরে নারীর জন্য পুরুষকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। নারীবাদীরা তখন যে ভাষায় তাঁদের এসব দাবি জানাচ্ছিলেন, সেই ভাষার মধ্যে নারী বোঝাতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছিল, এর একটি ছিল 'নারী' (women), অন্যটি 'যৌনতা' (sex), কিন্তু 'জেন্ডার' নয়। এই সময়েই জাতিসংঘের মাধ্যমে নারীসংক্রান্ত সকল বৈষম্য বিলোপের একটা আন্তর্জাতিক দলিলে (সিডও) সকল দেশকে স্বাক্ষর করিয়ে তা প্রতিপালনের কথা বলা হয়। লক্ষণীয়, সিডওর ঘোষণাপত্রেও 'নারী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যায়, সত্তর ও আশির দশকে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় নারীর প্রাণসাংস্কৃতিক (biocultural) অস্তিত্বের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, নারীর পরিচয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা হয় নি। ওই সত্তর-আশির দশকেই আরো একটা ব্যাপার ঘটে। প্রায় একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ফ্রান্সে, আর কিছু পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিক্ষার বিষয় হিসেবে মানবীবিদ্যা কিংবা নারীঅধ্যয়ন পঠনপাঠনের সূত্রপাত ঘটে। অর্থাৎ তখন নারীমুক্তি আন্দোলন এবং অ্যাকাডেমিক ভুবন উভয় ক্ষেত্রেই নারীকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ নারী হিসেবেই দেখা হচ্ছিল। পাশ্চাত্যের মতো ভারতবর্ষেও উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে নারীমুক্তি বিষয়ে নারীলেখকেরা একটু একটু করে কথা বলতে শুরু করেন।

কী পাশ্চাত্যে কী প্রাচ্যে, নারীমুক্তি আন্দোলনে মূলত দুটি বিষয়ের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, নারীরা তাঁদের অস্তিত্বের উপস্থিতির ওপর জোর দিয়েছেন; দ্বিতীয়ত, কেন নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকে গেছেন কিংবা তাঁদের নীরব থাকতে হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। যেমন রোজিকা পার্কার ও গ্রিসেল্ডা পোলোক ১৯৭০ সালে লিখছেন, শিল্পকলার নানা সংগঠনের ভেতরের ও বাইরের নারী

চিত্রশিল্পীদের একটাই মাথাব্যথা ছিল, আর তা হলো, চিত্রপ্রদর্শনী আয়োজনের ক্ষেত্রে পুরুষ এককভাবে সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। শুধু লন্ডনের প্রতিষ্ঠিত গ্যালারিগুলোতেই নয়, সেখানে বিকল্প যেসব গ্যালারি গড়ে উঠছিল, তাতেও ছিল পুরুষ শিল্পীদের একচ্ছত্র আধিপত্য। টিলি ওলসেন তাঁর 'নীরবতা' (১৯৮০) শীর্ষক বইয়ে এই অনুপস্থিতির কারণে নারী সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কী হারিয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে 'নিজের জন্য একটি কামরা' (উল্‌ফ্‌ ১৯২৯) গ্রন্থে ভার্জিনিয়া উল্‌ফও সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর এই অনুপস্থিতির প্রভাবের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বলা বাহুল্য হবে না যে, নারী বরাবরই সংস্কৃতির 'বিষয়' (object) আর 'ভোক্তা' (consumer) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সে একদিকে কলালক্ষ্মী (পুরুষের সাংস্কৃতিক উৎপাদনের উৎস), অন্যদিকে সংস্কৃতির বাহক (জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা যুদ্ধের সময়)। নারীবাদীরা এই সময়, অর্থাৎ গত শতকের আশির দশকে এভাবেই অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একইসঙ্গে সংস্কৃতির 'বিষয়' ও 'স্রষ্টা' হিসেবে নিজেদের উপস্থিতি জোরালোভাবে জানান দেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাই মূলত তখন একটা নারীবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়, আর সেই আন্দোলনটি ছিল একটা প্রত্নতাত্ত্বিক-বংশগতিক (archeological-genealogical) আন্দোলন, যার মূলকথা ছিল 'আমাদের মায়েদের সূত্রে অতীতে ফিরে যাবার চিন্তা করতে হবে'। এই কথাটা ছিল মূলত ভার্জিনিয়া উল্‌ফের। নারীবাদীরা এরই আলোকে নিজেদের সাংস্কৃতিক অবস্থানকে বুঝে নিতে চেয়েছেন। মাতৃত্বের মহিমা বা স্বীকৃতি বাংলা সংস্কৃতিতেও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীকে সাধারণভাবে হয় প্রেমিকা না হয় মা— এই দুই রূপে বেশি কল্পনা করা হয়। তবে বাঙালির আবেগের একেবারে কেন্দ্রে মাতৃভাবমূর্তির অবস্থান খুব সহজেই লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচ্যের সংস্কৃতির পার্থক্য মূলত এখানেই। বাংলা সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা মাতৃমূর্তির বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করি; যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী', শওকত ওসমানের 'জননী' এবং আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কথা। এই সময়েই পাশ্চাত্যে মানবীবিদ্যার নানা গুরুত্বপূর্ণ চর্চার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার মূলস্রোত থেকে নারী কতটা অনুপস্থিত, কেন এই অনুপস্থিতি, তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই তাঁরা বংশগতির ধারাকে পুনর্নির্মাণ করে নিয়েছেন, ইতিহাস পুনর্গঠন করেছেন, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অবহেলা করে ভুলে যাওয়া নারীদের লেখা পুনরুদ্ধার করেছেন, নতুন করে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কোনো অংশেই নারীর রচনা কিংবা শিল্পকর্ম পুরুষ লেখক-শিল্পীদের তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু পুরুষ লেখক-শিল্পী-সমালোচকেরা সেসব সৃষ্টিশীল কাজকে আমলে আনেন নি।

নারীবাদীদের এসব প্রচেষ্টা খুব অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে বৈশ্বিক, বিশেষ করে ইউরোমার্কিন সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট দ্রুত বদলে দেয়। 'ভুলে যাওয়া' নারীলেখক, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, ভ্রমণবিদ, পোশাক নির্মাতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, ডিজাইনার, আলোকচিত্রশিল্পী, নাট্যকার, কবি ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে যেসব নারী কাজ করেছিলেন, তাঁদের সৃষ্টিকর্ম পুনরাবিষ্কৃত, প্রকাশিত আর বিশ্লেষিত হতে থাকে। বিদ্যায়তনের যেসব বিষয়ে নারীশিক্ষকদের প্রাধান্য, যেমন সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান, এমনকি ইতিহাস, চিল্পশিল্পের ইতিহাস, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব এবং এই ধরনের নানা বিষয়ের নারীবাদী শিক্ষক ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণায় লিপ্ত হন। এসব অনুসন্ধান ও গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল পুনরাবিষ্কৃত সাংস্কৃতিক পূর্বনারীদের (cultural foremothers) সৃষ্টিকর্মকে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত বড়ো বড়ো কাজের পাশে জায়গা করে দেওয়া। ফলে গত শতকের মধ্য-সত্তরের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ইংরেজি সাহিত্যে শুধু জেন অস্টেন ও জর্জ এলিয়টের লেখা পড়ানো হতো, মধ্য-আশির দশকে এসে সেখানে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয় 'নারীর লেখা' বলে এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় পূর্ণাঙ্গ কোর্স শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নারীলেখকদের মধ্যে অ্যালিস ওয়াকার ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচনা অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হয়। এসব কোর্সের ওপর ভিত্তি করেই মূলত ১৯৮০-র দশকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ও জেন্ডার অধ্যয়নের সূত্রপাত ঘটে। এখন তো আমাদের বেগম রোকেয়ার রচনাও বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার ও নারীঅধ্যয়ন বিভাগে পড়ানো হয়। ইংরেজিতে প্রকাশিত পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংকলনেও রোকেয়ার লেখা পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। রোকেয়াকেও বলতে গেলে পুনরাবিষ্কার করেছেন প্রথমে বাংলাদেশ ও ভারতের নারীবাদী গবেষকেরা, এখন তাঁর লেখার গুরুত্ব স্বীকৃত হচ্ছে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন আলোচনাতেও। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইনের ভারতীয় শাখা থেকে ২০০৫ সালে রোকেয়ার লেখা 'সুলতানার স্বপ্ন' শীর্ষক রচনাটির ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছে।

'ভুলে যাওয়া' সাংস্কৃতিক কাজগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনরুৎপাদনের পাশাপাশি নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে ওই একই সময়ে নারীর সাংস্কৃতিক তত্ত্বনির্মাণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সূত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিও মনোযোগী হোন। তাঁরা দেখান যে, সমাজে নারীর জন্য নির্ধারিত বিশেষ যৌন ও লৈঙ্গিক অবস্থানই নারীর সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাকে আকার দিয়েছে। যেসব নারীবাদী লেখকের রচনা এই সাংস্কৃতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে সাহায্য করে, সেসব রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কেট মিলেটের 'যৌনরাজনীতি' (১৯৬৯), এলাইন শোওয়াল্টারের 'তাদের নিজেদের সাহিত্য' (১৯৭৭), সান্ড্রা এম গিলবার্ট ও সুসান গুবারের 'চিলেকোঠার পাগলি' (১৯৭৯), অ্যান ওকলের 'বিষয় নারী' ((১৯৮১) এবং রোজিকা পার্কার ও গ্রিসেল্ডা পোলোকের 'পুরানো গৃহকর্ত্রীগণ : নারী, চিত্রশিল্প ও মতাদর্শ' (১৯৮১) শীর্ষক বইগুলো। এই লেখাগুলো প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধস্তনতার শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করে দেয়, আর নারী ও জেন্ডার অধ্যয়নে 'নারীর লেখা' হিসেবে বিভিন্ন কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। নারীবাদী মতাদর্শের আলোকে নারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমের বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, যেমন 'ভিরাগো', 'উইমেন্স প্রেস', 'ডটার', 'নাইয়াড প্রেস', 'ওনলি ওমেন প্রেস' ইত্যাদি নারীদের লেখাকে এই সময় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে পাঠকের গোচরে নিয়ে আসে। এইসব প্রকাশনার প্রভাবে ভারতেও এই সময়ের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, যারা নারীবাদী বা নারীর বিষয় নিয়ে লেখা প্রকাশ করতে শুরু করে। এরকমই দুটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'কালি' ও 'স্ত্রী'। বাংলাদেশে যদিও নারীদের সৃষ্টিশীল বা ভাবনামূলক গদ্য প্রকাশের লক্ষ্যে এককভাবে কোনো প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবে 'নারীঅধ্যয়ন' বিষয়ের আওতায় নারীর লেখা ও নারীবিষয়ক লেখা প্রকাশ করে চলেছে 'নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা', 'বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ', 'উইমেন ফর উইমেন', 'যুক্ত'সহ বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের মধ্যে 'মাওলা ব্রাদার্স', 'সাহিত্য প্রকাশ'ও নিয়মিতভাবে নারীবিষয়ক বিভিন্ন বই প্রকাশ করছে। এর মধ্যে মাওলা ব্রাদার্স ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় প্রতিবছর 'জেন্ডার গ্রন্থমালা' শীর্ষক পরিকল্পনার অধীনে প্রকাশ করছে নারীবিষয়ক বিভিন্ন সংকলন।

বলা বাহুল্য যে, পাশ্চাত্য আর বাংলাদেশের উল্লিখিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য হলো নারীর ক্ষমতায়ন, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে নারীর সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তর সাধনে সাহায্য করা। পাশ্চাত্যে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নারীদের সৃষ্টিশীল ও অন্যান্য রচনা এভাবেই স্বীকৃতি, সমর্থন ও কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছে। এই সময়েই প্রথম প্রকাশ পায় নারীবাদী বিভিন্ন জার্নাল ও পত্রপত্রিকা, যেমন 'স্পেয়ার রিব', 'এমা' ইত্যাদি। অভিজাত ও প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থাগুলোও বুঝতে পারে যে, নারীর লেখার এখন একটা বাজার তৈরি হয়েছে। ফলে তারা 'ভুলে যাওয়া' নারীলেখকদের রচনা প্রকাশে এগিয়ে আসে। বিশ্বধ্রুপদী সিরিজের অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পুনঃপ্রকাশ করে শার্লট লেননক্স (১৭২৯-১৮০৪)-এর 'নারী ডন কিহোটো' (১৭৫২)। এইভাবে নারীর রচনা, বলা বাহুল্য যে, সাহিত্যের বড়ো বড়ো সৃষ্টিশীল কাজের (ক্যানন) বলয়ে ঢুকে পড়ে। নারীবাদী সমালোচকেরা এসব লেখা বিচার করে শিক্ষার্থীর কাছে নারীর সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার সূত্রগুলো ধরিয়ে দেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারী কোনো অংশেই অকিঞ্চিৎকর কাজ করেন নি, এখন সময় এসেছে বিশ্বভগ্নীতের বোধ সৃষ্টিরও। বাংলা ভাষায়ও কলকাতার 'এক্ষণ' পত্রিকা প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশ করে 'ভুলে যাওয়া' নারীদের আত্মজীবনী।

পাশ্চাত্যে গত শতকের সত্তর-আশির দশকে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নারীলেখকেরা কল্পবিজ্ঞানধর্মী উপন্যাস রচনা করতে শুরু করেন। দেখা যায়, নারীসুলভ মানবিক বোধ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরুষ কল্পবিজ্ঞান লেখকদের তুলনায় তাঁদের রচনা অনেকটাই আলাদা। সমন্বয়ের বোধ, গোষ্ঠীচেতনা, স্নেহস্পর্শ, শিশুর বেড়ে ওঠার প্রতি মনোযোগ এবং অহিংসার মতো গুণাবলি কল্পবিজ্ঞান নারীলেখকদের উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে (এলগিন ১৯৮৪, গেয়ারহার্ট ১৯৮০, রাস ১৯৭৫, উইটিগ ১৯৬৯)। কোনো কোনো লেখায় সম্পূর্ণ নতুন এক ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করে নারীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়ে নারীরা এই ভাষাভঙ্গি আবিষ্কার করেছেন এবং সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের রচনায় ব্যবহার করেছেন। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমা দুনিয়ায় ভিয়েতনাম ও স্নায়ুযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন হয়, নারীলেখকেরা সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই অত্যন্ত সংবেদনশীল আর মানবিকতায় স্নাত লেখাগুলো লিখতে থাকেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে অ্যাডরিয়ান রিখের 'সর্বনাশের মধ্যে ঝাঁপ দেয়া' (রিখ ১৯৭৩) শীর্ষক বইটার কথা বলা যায়। এই বইয়ে পুরুষই যুদ্ধ, পরিবেশ দূষণ, সন্ত্রাস ও শোষণের জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীও এর ফলে ধীরে ধীরে পৌঁছে

যাচ্ছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। 'বদলে ফেলার ইচ্ছা' গ্রন্থে রিখ পুরুষতান্ত্রিক এই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটেই আরো আগে বলেছিলেন, নারীদের এখন পুরুষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় হয়েছে।

নারীর লেখা কল্পবিজ্ঞানের গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে অপরিসীম। এই কল্পবিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই কাল্পনিকভাবে নারীরা বাস্তবে বিরাজমান প্রাধান্যমূলক পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামোকে 'যথাযথ' আর 'পরিশুদ্ধ' করে নিতে চেয়েছেন। এই লেখাগুলো সেদিক থেকে নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ইচ্ছাপূরণের সৃষ্টিশীল মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এরই প্রভাবে 'জেন্ডার ও জ্যঁর' (লেখার প্রকরণ) নারীর লেখা পাঠ এবং মানবীবিদ্যাচর্চার একটা প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীদের লেখা গোয়েন্দা উপন্যাস ও টেলিভিশন ধারাবাহিকগুলো তখন একইভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পুরুষ লেখকদের রচনায় নারীপাঠকেরা তাঁদের মনের খোরাক জোগাবার মতো বিষয় খুঁজে না-পেলেও নারীদের লেখায় তা খুঁজে পেয়েছেন। নারীবাদী গবেষকেরা এরই প্রেরণায় ওই সময় জনপ্রিয় সংস্কৃতি (popular culture), যেমন গোয়েন্দা উপন্যাস, রোমান্স, চটুল উপন্যাস, টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য উন্মোচনে মনোযোগী হোন। পরবর্তীকালে এসব বিষয়ও নারীঅধ্যয়নের বিষয় হয়ে ওঠে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নারীর বিনোদন কীভাবে ঘটে, সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশ ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে কোন সৃষ্টিশীলতার প্রতি তার আগ্রহ, নারীবাদী লেখকেরা সে-সবই বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, নারীর সাংস্কৃতিক সৃষ্টি অনেক বেশি মানবিক, সংবেদনধর্মী, সূক্ষ্ম, অন্তর্ভেদী। বাঙালি নারীলেখকেরা যদিও ওই সময় কোনো কল্পবিজ্ঞানধর্মী কথাসাহিত্য রচনা করেন নি, তবে সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের নারীদের লেখাতেও নারীর এই সংবেদনশীলতার প্রকাশ লক্ষ করি আমরা।

## নারী/নারীত্বের চিহ্নায়ন

বিশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরেই নারী তার আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার আর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে। সংস্কৃতির মধ্যেও নারী এসবের সন্ধান করেছে, অথবা একে ঘুরিয়ে বলা যায়, নারী সংস্কৃতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে। নারীর নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক-বংশগতিক ভাবনারও মূলকথা ছিল এটাই। নারী কেন 'নারী' (female) এটাই ছিল নারীর মূল অনুসন্ধানের বিষয়। সেই সঙ্গে নারীত্বের (feminity) ব্যাপারটিও সে শনাক্ত বা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। এ সবই করা হয়েছে ইতিহাস ঘেঁটে, সংস্কৃতির নানা দিক অনুসন্ধান করে। তাঁরা লক্ষ করেছেন সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে নারীর সৃষ্টি তার নিজস্ব আর অনন্য। পুরুষের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতা ও অভিজ্ঞতার তুলনায় তা পৃথক। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ অবশ্য অনেক আগেই 'নিজের জন্য একটি কামরা' গ্রন্থে এই পার্থক্য আর সংবেদনশীলতার ব্যাপারটি উল্লেখ করেছিলেন এইভাবে :

> I will only pause here one moment to draw your attention to the great part which must be played in [the future of fiction] so far as women are concerned by physical conditions. The book has somehow to be adapted to the body, and at a venture one would say that women's books should be shorter, more concentrated, than those of men, and so framed that they do not need long hours of steady and uninterrupted work… [T]he nerves that feed the brain would seem to differ in men and women, and if you are going to make them work their best and hardest, you must find out what treatment suits them. (Woolf 1929: 74)

উপন্যাস বা সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতা যে ভিন্ন, আর এই ভিন্নতাই যে তার সৃষ্টিশীলতাকে পৃথক করে দিয়েছে, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ সে কথাই বলতে চেয়েছেন এখানে। পারিবারিক সাংস্কৃতিক বলয়ে নারীর সৃজনীক্ষমতাকে যে প্রায় অগ্রাহ্য করা হয়েছে, কিংবা গ্রাহ্য করা হলেও সেই সাহিত্য যে আলাদা হয়ে গেছে, তিনি সেই বৈশিষ্ট্যের বিবরণই দিয়েছেন 'নিজের জন্য একটি কামরা' বইতে। নারীর শারীরিক সীমাবদ্ধতাই যে নারীর সাংস্কৃতিক পরিণাম হয়ে উঠেছে, উল্‌ফ্ সেই বিষয়টার ওপরেই গুরুত্বারোপ করেছেন। নারীর শরীর আর সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতার মধ্যে যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে, এই বইতে উল্‌ফের প্রতিপাদ্য ছিল সেটাই।

গত শতকের সত্তর ও আশির দশকে পাশ্চাত্যে এই দিকটাই, অর্থাৎ নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যের দিকটাই নারীবাদী ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। নারীর 'নারীত্ব' আবিষ্কার আর নারী-পুরুষের পার্থক্য চিহ্নিত করার

জন্যই তাঁরা এইদিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি ও সৃষ্টিশীলতার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য আছে, যা নারীর একান্ত নিজস্ব, কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সামাজিকভাবে অনুমাননির্ভর, আবার কিছু আছে আরোপিত। পুরুষই তার ইচ্ছে অনুসারে নারীর সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আবার নারী নিজেও তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। বাঙালি নারীলেখকেরাও পুরুষের তুলনায় নারীর জীবনভাবনা আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যে পৃথক, গত শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁদের নানা রচনায় তার উল্লেখ করেছেন। নারীর এই আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই বেগম রোকেয়ার রচনায়। এর পর আরো বেশ কয়েকজন নারীলেখক এ নিয়ে নানা ধরনের লেখা লিখেছেন।

একদিকে নারীর এই আত্মস্বাতন্ত্র্যের বোধ, অন্যদিকে নারীবাদী ভাষাতাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন, নারী পুরুষের তুলনায় কতটা ভিন্ন ভঙ্গি বা রীতিতে কথা বলে, ভাষার ব্যবহার ঘটায়। এই ব্যবহারের মধ্যে নারী যে অধস্তন, নির্ভরশীল, দ্বিধান্বিত, নির্যাতিত— সেসব প্রকাশ পায়। পুরুষতন্ত্রই নারীর ভাষারীতিকে এমন করে দিয়েছে। আবার নারীর নিজস্ব স্বভাবজ কিছু প্রবণতা আছে, যেমন পুরুষের তুলনায় সে অনেক বেশি সাহায্য করতে উন্মুখ, সমন্বয়ধর্মী, সহযোগিতা করার ব্যাপারে আগ্রহী, সহজ যোগাযোগে বিশ্বাসী, আর্তের প্রতি সেবাপরায়ণ (স্পেন্ডার ১৯৮০)। কিন্তু পুরুষ ভাষাকেও এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে যে পুরুষতন্ত্রই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের নারীবাদীরা এরই প্রভাবে গত শতকের সত্তর ও আশির দশকে এই ভাষাকাঠামোকে আঘাত করে সর্বজনীন ভাষাব্যবহারকে লিঙ্গনিরপেক্ষ করতে চেয়েছেন। বিশেষ করে, নারীর বৈবাহিক পরিচয় বড়ো হয়ে যাতে তার আত্মপরিচয় বা নিজস্বতা হারিয়ে না-যায়, ভাষার বৈষম্যমূলক সেইসব শব্দ বা শব্দের ব্যবহারকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন (মিলার ও সুইফট ১৯৮০)। নারীবাদীরা এই লক্ষ্যে এমন অভিধান তৈরি করেছেন, যে অভিধান জেন্ডারের দিক থেকে ভারসাম্যমূলক আর নারীর প্রতি সংবেদনশীল হবে (উইটিগ ও জেইগ ১৯৭৬, মিলস ১৯৮৯)। নারীবাদীদের প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য ছিল, নারীর জন্য আর নারী কর্তৃক এমন একধরনের ভাষারীতি বা ভাষাব্যবহারের সূত্রপাত ঘটানো, যা পুরুষতন্ত্রের বিলোপ সাধনে সাহায্য করবে।

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের নারীবাদীদের এই সময় প্রধান লক্ষ্য ছিল, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির আমূল রূপান্তর সাধন করা। প্রাচ্যে নারীরা চেয়েছেন আত্মস্বীকৃতি, আত্মমর্যাদার পরিসর। তবে নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে নয়, নারীত্বকে স্বীকরণ করেই তাঁরা এই রূপান্তর সাধনে এগিয়ে এসেছেন। ফলে তাঁরা নারীর আত্মসত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে নারীর নারীত্বকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, অগ্রাহ্য করেছেন আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে (ক্রিস্তেভা ১৯৮০)। ভাষার পাশাপাশি পাশ্চাত্যে তাই দেখা যায়, নারীবাদীদের কাছে নারীর শরীর এই সময় আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসছে। শরীর, বলাবাহুল্য, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ থেকে সিমোঁন দ্য বোভেয়ার পর্যন্ত নারীমুক্তিকামী অনেক লেখকেরই মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। গত শতাব্দীর শেষ দু'-তিন দশকে নারীর শরীর নিয়ে মূলত দুটি প্রবল মতাদর্শিক ধারা প্রবহমান ছিল। একদিকে কোনো কোনো নারীবাদী নারীর শরীরকে নারীমুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক মনে করেছেন; অন্যদিকে আবার কেউ কেউ নারীশরীরই নারীর বৈশিষ্ট্য এবং এই শরীরকে ইতিবাচক অর্থে গ্রহণ করে নারীমুক্তির কথা বলেছেন। তবে আমাদের, অর্থাৎ প্রাচ্যে নারীর শরীর নিয়ে এক ধরনের সংস্কার আছে। বিশেষ করে, মহাকাব্যের যুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে পদার্পণের পর এই সংস্কার নৈতিকতার মানদণ্ডে দেখা হয়। ফলে এই নিয়ে তাই তেমন একটা উচ্চবাচ্য করা হয় না। ধর্মীয় বিধিনিষেধও নারীর শরীরকে সহজভাবে দেখার ও দেখাবার সাংস্কৃতিক প্রচলন ঘটায় নি। বেগম রোকেয়ার রচনাতেই বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীকে তার শরীর নিয়ে যে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়, তার উল্লেখ আছে। রোকেয়া দেখিয়েছেন, বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীর শরীরকে কখনোই সহজভাবে দেখা হয় না। এতে নারীর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। পর্দাপ্রথার অহেতুক বাড়াবাড়ির মাধ্যমেই নারীর জীবন যে কখনো কখনো বিপন্ন হয়ে পড়ে, রোকেয়া তাঁর বিভিন্ন লেখায় সেটা উল্লেখ করেছেন। তবে বাঙালি সংস্কৃতিতে এই ধরনের সংস্কার প্রচলিত থাকলেও পাশ্চাত্যে কিন্তু নারীর শরীর নিয়ে তেমন একটা সংস্কার নেই। নারী-পুরুষ উভয়ের শরীরই কী সাহিত্য, কী সংস্কৃতি, কী ব্যক্তিগত-সামাজিক জীবন, সর্বত্রই সহজভাবে দেখা হয়।

পাশ্চাত্যে প্রকৃতপক্ষে নারীশরীরের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যায়। অনেকের মতে, সেখানে নারীশরীরের খোলামেলা ব্যবহার শুরু হয় বিশ শতকের গোড়ার দিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, আর বিশ্বায়নের প্রভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীশরীরের ব্যবহারের মাত্রাও বেড়ে যায়। শরীরের নানা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নারী যে বিশেষ শারীরিক গঠনের অধিকারী, নারীবাদীরা তা অস্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে, নারীর যৌনাঙ্গের বিশেষ গঠন ও ঋতুস্রাবের চক্রাবর্তন এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। গত

শতকের সত্তরের দশকে মার্কিন নারী চিত্রশিল্পী জুডি শিকাগো একটা সিরিজ ছবি এঁকেছিলেন, নাম 'ডিনার পার্টি'। ওই ছবিতে ৩৯টি খাবারের প্লেট আছে, প্লেটগুলো পোর্সেলিনের আর তাতে জুডি এঁকেছেন ৩৯ জন প্রখ্যাত নারীর যৌনাঙ্গ। একটি ত্রিকোণবিশিষ্ট টেবিলে এই প্লেটগুলো সাজিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন জুডি। চিত্রসমালোচকদের মতে, জুডির ছবিগুলো একইসঙ্গে নারীর যৌনাঙ্গ আর প্রজাপতি এই দু'য়েরই অনুভূতি জাগায় দর্শকের মধ্যে। এখানে বলা প্রয়োজন, প্রতীকী এই ছবিগুলো জুডি আঁকেন লিয়োনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার' ছবির প্রতিক্রিয়ায়, যেখানে দেখা যায় নারীই ইতিহাসের সকল পর্যায়ে সারাজীবন ধরে খাবার রান্না করে চলেছে, আর পুরুষেরা নারীর সেই শ্রমকে অব্যাহতভাবে শোষণ করে যাচ্ছে। জুডির এই ৩৯টি ছবি মূলত ৩৯ জন প্রখ্যাত নারীকে কেন্দ্র করে আঁকা। পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এই নারীরা নানা কারণে খ্যাত ছিলেন। মেসোপটেমিয়ার প্রখ্যাত জীবনদাত্রী দেবী ইস্থার থেকে শুরু করে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, এমনকি সিমোঁন দ্য বোভেয়ারকে বিষয় করে যৌনাঙ্গের এই ছবিগুলো এঁকেছিলেন জুডি। লক্ষ্য ছিল নারীর সংগ্রামকে, তার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা, যেখানে নারীর যৌনপরিচয়ই বড়ো হয়ে ওঠার কথা নয়, তার আত্মপরিচয় বা আত্মসত্তার ব্যাপারটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই একই ভাবনায় ব্রিটিশ নাট্যকার কেরিল চার্চিল লেখেন 'টপ গার্ল' (১৯৮২) শীর্ষক একটা নাটক, যার প্রথম দৃশ্যটি লাস্ট সাপারের আদলে কল্পিত। নারীবাদীরা বলেছেন, সমকালীন আরেক শিল্পী জর্জিয়া ওকেফি ফুলের যে ছবিগুলো এঁকেছেন সেই ছবিগুলোও যৌনাঙ্গকে কেন্দ্র করে আঁকা। এমনকি নারীবাদীদের মতে, মেহিকোর প্রখ্যাত নারীচিত্রশিল্পী ফ্রেইডা কাহলো যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেই ছবিগুলো নারীশরীরের অধস্তন, আক্রান্ত অবস্থাকে মূর্ত করে তুলেছিল। নারীশরীরের এই চিত্রায়ণ দর্শকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। নারী চিত্রশিল্পীদের উল্লিখিত ছবি, বলা বাহুল্য, নারী আর নারীত্বের নানা দিক উন্মোচিত করে দিয়েছে। নারীবাদীরা এভাবেই সাংস্কৃতিক পরিসরে নারীর নতুন ভাবমূর্তি নির্মাণ করেছেন, সংস্কৃতিতে তাঁরা যে পুরুষের তুলনায় বিশিষ্ট, তা-ও তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশের নারী চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি, নারীভাবনার দিক থেকে যে গুরুত্ববাহী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে শুধু নারীর শরীর নয়, এর পাশাপাশি নারীর মনও নারীবাদীদের লেখায়, চিত্রশিল্পে, আলোকচিত্রে এবং সংস্কৃতির নানা মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই লক্ষ্যে গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে পশ্চিমে মনঃসমীক্ষণবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেন কিছু নারীবাদী। এর আগে পর্যন্ত 'নারীর মনমানসিকতা গভীরতর কোনো বোধকে ধারণ করতে পারে না', কিংবা 'নারীর মন পুরুষের তুলনায় নিচু'— এরকম ধারণাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু নারীবাদীরা ওই সময় পুরুষকেন্দ্রিক এই ধারণাকে ভেঙে দিয়ে নারীঅস্তিত্বের ইতিবাচক দিকগুলো তাঁদের আলোচনায় প্রাধান্য দিতে থাকেন। ফলে নারী উন্মার্গগামী আর সন্তান জন্মদানের পর বিষণ্নতায় ভোগে এই ধারণাকে অগ্রাহ্য করার আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বিশ্বের সঙ্গে নারীকে যুক্ত করে দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পাশ্চাত্যেও নারীবাদী লেখকেরা আবিষ্কার করেছেন এমিলি ডিকিনসনের কবিতা, অ্যালিস জেমসের দিনপঞ্জি, শার্লোট পারকিন্স গিলম্যানের ছোট্ট উপন্যাস 'হলুদ ওয়ালপেপার' (১৮৯২), হিল্ডার 'সে' (১৯২৭) শীর্ষক লেখা। এছাড়া সমকালীন কিছু উপন্যাস, যেমন সিলভিয়া প্লাথের 'দি বেল জার' (১৯৬৩), ইভা ফিগসের 'দিনগুলো' (১৯৭৪), মেরি কারডিনালের 'যে কথা বলতে চাও বলো' (১৯৭৫) এবং জেনিস গ্যালোওয়ের 'নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য কুশলী হওয়া' (১৯৮৯)— এই ভাবনা অবলম্বনেই রচিত হয়েছে। এই একই প্রেরণায় ওই সময় ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, অ্যান সেক্সটন ও সিলভিয়া প্লাথের জীবনীর পুনর্মূল্যায়ন করেছেন নারীবাদী লেখকেরা। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কেসহিস্ট্রি ও হিস্টিরিয়ার ইতিবৃত্তগুলোকেও নতুনভাবে পড়েছেন তাঁরা, মূল্যায়নও করেছেন। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব নারীমুক্তির পথনির্দেশ করে না বলেও তাঁদের মনে হয়েছে। তবে এই ধারায় নারীবাদীদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত মনোশারীরিক প্রতিক্রিয়া আর ভাবনা নারীমুক্তি ঘটাতে পারে বলে তাঁরা মনে করেছেন। এই সময় তাই দেখা যায়, 'নারী ও পাগলামি' বিষয়টি অনেক নারীর আলোচনা-পর্যালোচনা-ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে উঠেছে। মানবীবিদ্যা বা নারীঅধ্যয়নের পাঠ্যসূচিতেও এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নারীশরীরের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে গত কয়েক দশক ধরে সবচেয়ে বেশি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন ফরাসি নারীবাদীরা। এটাই ছিল তাঁদের নারীবিষয়ক লেখালেখির কেন্দ্রীয় বিষয়। নারীশরীরকে তাঁরা সংস্কৃতির প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করে সংস্কৃতি ও সমাজে নারীর অবস্থান কোথায় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেসব ফরাসি নারীবাদী এই ব্যাখ্যা দেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, লুসি ইরিগেরে (১৯৭৪, ১৯৭৭), জুলিয়া ক্রিস্তেভা (১৯৭৪,

১৯৭৭) ও হেলেন সিসু (১৯৮১)। আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত সিসু আর বুলগেরীয় বংশোদ্ভূত জুলিয়া ক্রিস্তেভা দু'জনেই মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের নারীবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ভাষা শুধু পুরুষের সৃষ্টি নয়, মাতৃত্ব ও নারীত্বের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক গভীর। তাঁদের মতে, ভাষা একই সঙ্গে চিহ্নতাত্ত্বিক ও প্রতীকী দুই বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে। এই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভাষিক উচ্চারণ এক ধরনের স্বতঃপ্রণোদিত শারীরিক ব্যাপার। ভাষা অর্জনপূর্ব সময়ে শিশু মায়ের সঙ্গেই একাত্ম বোধ করে বেশি। মায়ের সঙ্গে তার গভীর বন্ধনের সৃষ্টি হয়, মাকে ঘিরেই সে জুইসঁস বা মানসিক-শারীরিক পরমানন্দ লাভ করে। মায়ের কোলে থাকতে থাকতেই ভাষার শব্দ বা ধ্বনি পুনরাবৃত্ত হতে হতে শিশুর শ্রবণে এমনভাবে ধরা দেয় যে, সে তা সহজেই শিখে ফেলে। তাঁরা মনে করেন, প্রতীক নয় ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য মূলত চিহ্নতাত্ত্বিক, ভাষার অর্থ মূলত পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গে। সংস্কৃতি ছাড়া ভাষার কোনো নিরপেক্ষ তাৎপর্য বা অর্থ নেই।

উল্লিখিত ব্যাখ্যা অনুসারে ভাষামাত্রই সাংস্কৃতিক আর নারীভাবাপন্ন। হেলেন সিসু ভাষার এই বৈশিষ্ট্যকেই 'এক্রিতুর ফেমিনিন' বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলায় একে আমরা 'নারীলিখন' বলে উল্লেখ করতে পারি। কেউ কেউ আবার একে 'শরীরলিখন' (writing the body) বলেও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদ অনুসারে বলা যায় যে, ভাষার সঙ্গে নারীশরীরের একটা সম্পর্ক আছে। শিশুর ভাষাঅর্জন প্রক্রিয়া নারীশরীরের সঙ্গেই মূলত যুক্ত। অনেকে অবশ্য পুরুষের লেখার সঙ্গে নারীর সংস্কৃতিকে ঠিক ঠিক মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি বলে ক্রিস্তেভার সমালোচনা করেছেন। তবে একথা সত্য যে সিসু আর ক্রিস্তেভার ব্যাখ্যা অনুসারে ভাষা মূলত চিহ্নতাত্ত্বিক, যার অর্থ পরিস্ফুট হয় মাতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে। তাঁদের এই ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে পৌরুষের যে সংস্কৃতি পশ্চিমা সমাজে প্রচলিত আছে, তাতে এক ধরনের মতাদর্শিক আঘাত হানে। ফলে শরীরলিখন তত্ত্বটি ১৯৮০-র দশকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হিসেবে সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে; বিশেষ করে মঞ্চনাটক, চলচ্চিত্র, প্রদর্শন অধ্যয়নের (performance studies) ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল গভীর। এরই ধারাবাহিকতায় প্রদর্শনশিল্প; যেমন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর কী ধরনের শরীরী উপস্থাপন ঘটছে, নারীবাদীরা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গণমাধ্যমে নারীর উপস্থিতিকে তাঁরা নানাভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন।

ক্রিস্তেভা ও সিসুর তুলনায় ইরিগেরে তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন নারীর শারীরিক গঠনপ্রকৃতির ওপর। সমকালীন অন্যান্য নারীবাদী ভাবুকের মতো তিনিও ভেবেছেন সংস্কৃতি হচ্ছে মূলত শিশ্নকেন্দ্রিক। তিনি এই ধারণাকে অস্বীকার করে এর বিপরীতে নারীর যৌনতার এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বললেন, যা পুরুষতান্ত্রিক শিশ্নপ্রাধান্যকে নস্যাৎ করে দেয়। তিনি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন যে, আক্ষরিক ও প্রতীকী দু'দিক থেকেই নারীর যৌনতা বা লৈঙ্গিক রূপ একটি নয়— অনেক (ইরিগেরে ১৯৭৭)। নারী প্রকৃতপক্ষে পুরষকেন্দ্রিকতা বা শিশ্নকেন্দ্রিকতার বাইরে থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সেদিক থেকে নারীর সাংস্কৃতিক কর্মতৎরতার কোনো লৈঙ্গিক বৈষম্যমূলক রূপ নেই। নারীকে এখন থেকে তাই নারীর সঙ্গে সহমর্মিতার সূত্রে কাজ করে যেতে হবে, পুরুষের সমর্থন নারীর প্রয়োজন নেই। ইরিগেরের এই আদর্শিক অবস্থান, বলা বাহুল্য যে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থাকেই নির্দেশ করে। তাঁর এই সাংস্কৃতিক-মতাদর্শিক অবস্থান শুধু ফ্রান্সে নয়, ইতালিতেও আলোড়ন তোলে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সুসি, ক্রিস্তেভা ও ইরিগেরের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নারী আর নারীত্বেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা নারীত্বকে বিসর্জন দেন নি, আবার পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে এই নারীত্বকে বিলীন করে ফেলেন নি। নারীর সঙ্গে নারীর গভীর সম্পর্ক আর পুরুষের সঙ্গে নারীর পার্থক্যের নানা দিক তাঁরা তাঁদের লেখায় উপস্থাপন করে সংস্কৃতির নতুন সূচনা ঘটান।

## পার্থক্যের সূত্র ও মাত্রা

গত শতকের সত্তর-আশির দশকে আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান ইতালিতেও এসে লাগে মার্কিন-ফরাসি নারীবাদের ঢেউ। তবে ইতালিতে এই সময় নারীবাদের যে সূত্রপাত ঘটে, তার প্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌। উল্‌ফের ভাবনার অনুসরণে ইতালীয় নারীবাদীরা মনে করেছেন যে, পুরুষের সবকিছুর বাইরেই নারীর অবস্থান। ফলে তখন সে-দেশে নারীর সঙ্গে নারীর এক ধরনের নতুন সামাজিক-প্রতীকী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইতালির মিলান শহরের 'সম্মিলিত নারীগ্রন্থ বিক্রেতা সংঘ' (১৯৯০) ঘোষণা করে, নারীরা যদি পারস্পরিক আস্থা আর বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে পারেন, আর সংস্কৃতিতে অংশ নিতে পারেন, তাহলেই

নারীমুক্তি অর্জন সহজ হবে। সমগ্র নারীগোষ্ঠীকে তাঁরা এই মুক্তির লক্ষ্যে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমত, 'এক শ্রেণির নারী আছেন, যাঁরা জানতে চান' (এই নারীরা কম জ্ঞানী আর কম সম্পদের অধিকারী); দ্বিতীয়ত, 'আরেক শ্রেণির নারী আছেন, যাঁরা জানেন' (এঁরা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নারী)। ইতালীয় নারীবাদ, বলা প্রয়োজন, নারীমুক্তির পথ হিসেবে নারী-পুরুষের পার্থক্যের পাশাপাশি নারীর সঙ্গে নারীর পার্থক্যের ব্যাপারটিকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছে। ইতালীয় নারীবাদীদের মতে, নারীদের মধ্যেই যদি পার্থক্য দুস্তর হয়ে ওঠে, তাহলে নারীমুক্তি আসবে না। পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে হলে নারীদের মধ্যেও পার্থক্যের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে; যতটা সম্ভব, যতদূর সম্ভব এটা কমানো প্রয়োজন।

ইতালীয় নারীবাদ কখনো ফরাসি নারীবাদের মতো ইউরোপ ও অবশিষ্ট বিশ্বে ততটা জনপ্রিয় হয় নি। ফরাসি নারীবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মূলত মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের কারণে। এই তত্ত্বটি সিগমুন্ড ফ্রয়েড থেকে শুরু করে জ্যাক লাকাঁ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে ক্রিস্তেভা-সিসু-ইরিগেরে পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। নারীবাদী রাজনীতি, নারীর যৌন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে একত্রে বিবেচনা করে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের ফলে ফরাসি নারীবাদ নারীমুক্তির উৎস ও প্রেরণা হয়ে ওঠে। ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানির নারীদের মধ্যে এই তত্ত্বটি ব্যাপক আলোড়ন তোলে। নারীবাদী তত্ত্বের ধারায় এরই প্রভাবে পুরুষতন্ত্রকে বস্তুবাদী-প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার রীতি শুরু হয়। ওই সব দেশে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ নারীর অধস্তন অবস্থান ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দৃষ্টিকোণ, দেখা গেছে, শুধু রাজনৈতিক ছিল না, ছিল সাংস্কৃতিকও।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক বৈষম্য আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীভাবমূর্তিকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। নারীবাদীরা নারীভাবমূর্তিকে নানা দিক থেকে পুনর্গঠিত করেছেন। এটা করা হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে 'নারী' ও 'নারীত্ব'কে নতুনভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উত্তীর্ণ করার মধ্য দিয়ে। নারীর পুরুষতান্ত্রিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে সিমোঁন দ্য বোভেয়ার বলেছিলেন, 'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, তাকে নারী করে তোলা হয়'। এই কথাটাকেই নারীবাদীরা গ্রহণ করে নারী যে মূলত পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলের কারণেই অধস্তন হয়ে পড়ে, সেই বিষয়টাকেই প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন। বোভেয়ারের এই কথাটাকে যে দু'জন নারীবাদী নারীর সাংস্কৃতিক বৈষম্যের উৎস বলে মনে করেছেন, তাঁরা হলেন মনিকা উইটিগ (১৯৮১) এবং মেরিলিন ফ্রাই (১৯৯০)। উইটিগ ও ফ্রাই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বিশেষ একটা শ্রেণি হিসেবে 'নারী'কে যেভাবে চিহ্নিত ও বিবেচনা করা হয়, তা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, নারীর সঙ্গে যা-কিছু যুক্ত তার সবই সামাজিক-সাংস্কৃতিক। নারীর শারীরিক ব্যাপারটা কখনোই বড়ো করে দেখার বা গুরুত্ব দেয়ার কিছু ছিল না। সভ্যতার প্রায় শুরু থেকেই নারীকে যে পুরুষতন্ত্র অধস্তন করে রেখেছে, তা করা হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, আর এই মূল্যবোধ যে পুরোপুরি সাংস্কৃতিক, তা না-বললেও চলে। উইটিগ ও ফ্রাই মনে করেন, 'নারী' আসলে পুরুষের ভাবনা-আকাঙ্ক্ষারই প্রতিরূপ মাত্র। বাস্তবের নারীর সঙ্গে পুরুষের ভাবনায় সৃষ্ট নারীর কোনো মিল নেই। ফলে নারী বলতে পুরুষ যা বোঝায়, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন এক ব্যাপার হয়ে পড়ে। পুরুষ তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যে নারী সৃষ্টি করেছে, সেই নারী আসলে প্রকৃত নারী নয়।

তবে আগেই যেমন বলেছি, ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে নারীবাদীরা গুরুত্ব দিয়েছেন, নারীর সঙ্গে নারীর সামগ্রিক পার্থক্যের ওপর, এই পার্থক্য ঘুচিয়ে আনার ওপর। বলা প্রয়োজন, পূর্বদেশে অর্থাৎ প্রাচ্যে নয়, নারীবাদী এই ভাবনা কাজ করছিল পশ্চিমের নারীদের মধ্যে। পশ্চিমের নারীদের সমস্যাও পূর্বদেশীয় নারীদের তুলনায় সমসময়ই ছিল আলাদা। এখানে পশ্চিমের সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিও বিবেচনায় আনা বাঞ্ছনীয়। পশ্চিম, বিশেষ করে ইউরোপকে সভ্যতার পীঠস্থান বলে গণ্য করা হয়। ইউরোপে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ হয়েছিল, সমগ্র ইউরোপীয় সমাজ, এমনকি সারা পৃথিবী তার প্রভাবে আধুনিক জীবনবোধে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এরই প্রভাবে মানুষের ভাবনা ও বস্তুজীবন ব্যাপকভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু নারীর জীবন, পশ্চিমা নারীবাদীদের মতে, পুরুষতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ছকের খুব একটা বাইরে আসতে পারে নি। নারীর সঙ্গে নারীর পার্থক্যও ঘোচে নি। ফলে বিভিন্ন শ্রেণির নারী, যেমন সমকামী নারী, কৃষ্ণাঙ্গ নারী, শ্রমজীবী নারী— সবাই নারীর সঙ্গে নারীর সহমর্মিতা ও ঐক্য গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা সকলেই মনে করেছেন, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি যেহেতু এখনো সর্বত্রই প্রভাব বিস্তার করে আছে, এর রূপও সর্বজনীন, ফলে সারা বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে ইউরোপীয় নারীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন

করতে হবে। নারীবাদীরা নারীর সঙ্গে নারীর এই সহযোগিতাকে 'বৈশ্বিক ভগ্নীত্ব'-এর ঐক্য বলে চিহ্নিত করেন। মূলত এই অবস্থানের কারণেই নারীবাদীরা বেটি ফ্রাইডানের লেখা 'নারীত্বের রহস্য' (ফ্রাইডান ১৯৬৩) গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করেছেন (হুক্‌স্ ১৯৮৪), যে গ্রন্থে নারীজীবনের পরিণামকে অনেকটাই স্বামী, গৃহ, সন্তানের মধ্যে আবর্তিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নারীদের ভাবনা ও লেখালেখি এভাবেই নারী-পুরুষের পার্থক্যের পরিবর্তে নারীর সঙ্গে নারীর যে পার্থক্য আছে, সেই বিষয়টাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এ কারণেই ১৯৮০-র দশকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গ, সমকামী, শ্রমজীবী নারীদের ব্যাপকভাবে তৎপর দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নতুন উদ্দীপনার। নানা কর্মসূচি, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীর সঙ্গে নারীর সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য তাঁরা এগিয়ে আসেন। নারীর সঙ্গে নারীর সাংস্কৃতিক বন্ধনে সৃষ্টি হয় এক নতুন ইতিহাস। এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তা হলো, আমেরিকায় অ্যালিস ওয়াকার, টনি মরিসন, পউলা মার্শাল, নৎজাকে শ্যাঙ্গে, অড্রে লর্ডে ও মায়া অ্যাঞ্জেলুর মতো একঝাঁক শক্তিশালী আফ্রিকীয়-আমেরিকান নারীলেখকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের রচনা নারী তো বটেই পুরুষদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া জাগায়। অ্যাকাডেমিক, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও তা গুরুত্ব পেতে থাকে, তাঁদের রচনা পুনর্গঠিত পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

লক্ষণীয়, কৃষ্ণাঙ্গ এই নারীলেখকেরা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা মার্কিনী সংস্কৃতির একেবারে মূল ধরে টান দেন। নারীঅভিজ্ঞতার নির্যাস হিসেবে তাঁদের লেখায় একদিকে যেমন উঠে আসে আমেরিকার দাসপ্রথার মর্মান্তিক ইতিহাস, বর্ণবাদী বৈষম্য-নির্যাতন ইত্যাদির কথা, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা রচনা করেন 'উঁচু সংস্কৃতি' বলে কথিত সাহিত্য— কবিতা, গল্প, উপন্যাস। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা অ্যালিস ওয়াকারের 'দি কালার পার্পল' (ওয়াকার ১৯৮২) উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এই উপন্যাসকে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন 'নারীর উপন্যাস' বলে। শুধু একজন নারী লিখেছেন বলে নয়, এর মূল বিষয়বস্তুই নারী। সংক্ষেপে এর কাহিনিটা এরকম : উপন্যাসের কৃষ্ণাঙ্গ নায়িকা সিলি। ঈশ্বরের কাছে তার জীবনের কথা বলে চিঠি লেখে। মেয়ে, বউ, বোন আর মা হিসেবে তার ভূমিকা সম্পর্কে জানায়। কিন্তু ঈশ্বর তো ঈশ্বরই, সিলির কাছে সে ধরা দেবে কেন? জীবনের এইসব মুহূর্তেই তার দেখা হয়ে যায় একই অভিজ্ঞতা নিয়ে বেড়ে ওঠা বেশ কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীর সঙ্গে। এই নারীরাই তার জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ বদলে দেয়, তার জীবনকে নির্দিষ্ট একটা রূপ দেয়। সিলির বোন নেত্তি, আফ্রিকায় মিশনারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়। আরেক নারীগায়ক শাগ আভেরি সিলিকে রক্ষায় এগিয়ে আসে। সোফিয়ার মানসিক দৃঢ়তা ও সাহস সিলিকে বেঁচে থাকার ও জীবনযাপনের শক্তি জাগায়। পুরো উপন্যাসে এক নারী মূলত অন্য অনেক নারীর সাহচর্যে একদিকে যেমন এককভাবে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়, তেমনি বুঝতে শেখে কীভাবে যৌথভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে জীবনযাপন করতে হবে। ওয়াকারই প্রথম নারীর নতুন এই অবস্থাকে বোঝানোর জন্য 'ওম্যানিস্ট' (womanist) শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। এই শব্দটির বঙ্গানুবাদ প্রকৃতপক্ষে কী হবে বলা মুশকিল। ইংরেজিতে নারী বলতে 'ফিমেল' ও 'ওম্যান' এই দুটি শব্দ প্রচলিত আছে। বাংলাতেও এরকম তিনটি বহুল প্রচলিত শব্দ আছে— নারী, মহিলা, রমণী। 'রমণী' শব্দটির সঙ্গে রমণের সম্পর্ক থাকায় পুরুষতন্ত্রের সাংস্কৃতিক প্রতিফলন হিসেবেই তা গণ্য হবে বলে আমার ধারণা। 'মহিলা' শব্দটি আবার সাধারণ ধারণা না-দিয়ে উঁচু সম্ভ্রমবোধ জাগায় বলে সর্বজনীন হয়ে ওঠে না। এই শব্দটিও পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বলে আমার মনে হয়। 'মহিলা' বললে এমন এক শ্রেণির নারীর কথা মনে আসে, যারা গণপরিসরে স্থান করে নিতে চায় না কিংবা পুরুষতন্ত্রই তাদের সেই পরিসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তুলনামূলকভাবে 'নারী' শব্দটি সাংস্কৃতিকভাবে অনেকটাই সর্বজনীন। অন্তত এভাবেই শব্দটি ব্যবহৃত হতে হতে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। নারী দিয়ে আবার সহজেই নারীবাদ শব্দটি তৈরি করা যায়। সবদিক থেকে বিবেচনা করলে ইংরেজি 'ওম্যান'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'নারী'ই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শব্দ বলে মনে হয়। কিন্তু 'ওম্যানিস্ট'-এর বাংলা পরিভাষা কী হবে? নারী থেকে নারীবাদ? তাহলে ফেমিনিজমের যে বাংলা করা হয়েছে 'নারীবাদ' তার সঙ্গে এই শব্দের অর্থগত সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝানো যাবে কীভাবে? 'মহিলাবাদ'ও তো করা যায় না! পরিভাষার এই এক সমস্যা বটে! এই সমস্যার সমাধান করা সত্যি কঠিন। কিন্তু ওয়াকার যে 'ওম্যানিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার তাৎপর্য বেশ গভীর বলেই মনে হয়। তিনি ইংরেজি 'হিউম্যানিস্ট' (মানবতাবাদী) শব্দটির আদলে 'ওম্যানিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নারীবাদের মধ্যে পুরুষতন্ত্রকে জোরালোভাবে বিরোধিতার যে মতাদর্শিক দিকটি আছে, যার ফলে অনেক পুরুষ নারীবাদকে উগ্র একটা তত্ত্ব বলে মনে করেন, তিনি হয়ত তাই মানবিকতার অনুষঙ্গ আসে আবার নারীর পৃথক অবস্থাকেও নির্দেশ করা যায়,

সেরকম একটা শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থেকেই 'ওম্যানিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই, নারীবাদী চিন্তার সাংস্কৃতিক রূপান্তরের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। নারীকে শুধু নারী-পুরুষের পার্থক্যের জায়গা থেকে নয়, মানবিক দিক থেকেও বিবেচনায় আনতে হবে, হয়ত এটাই অ্যালিস ওয়াকারের ভাবনায় কাজ করেছে।

ওয়াকার ও অন্য কৃষ্ণাঙ্গ নারীলেখকেরা মূলত যে কথাটা বলতে চেয়েছেন তা হলো, শুধু শ্বেতাঙ্গ নয়, কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষেরাও কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সঙ্গে অজাচার, পারিবারিক সহিংসতা, নির্যাতন, পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া, অবহেলা-অপমানের মতো অপরাধ করে থাকে। কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষেরা অনেকেই আবার একমত হতে পারেন নি। তাঁরা মনে করেছেন, এই অভিযোগ তুলে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন (ওয়ালেস ১৯৯০)। প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা বলেছেন, পুরুষ সে যে-ই হোক— কালো কিংবা সাদা— নির্যাতন করলে তার বিরুদ্ধে বলার অধিকার তাঁদের রয়েছে। নারীবাদীরা কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের নতুন এই অবস্থানকে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের একটা অংশ বলে মনে করেন। শ্বেতাঙ্গ নারীবাদ কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের জীবন, তাঁদের ভাবনা আর পুরুষতান্ত্রিক অবস্থাকে তুলে ধরতে পারে নি বলেই কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা এইভাবে নিজেদের সাংস্কৃতিক-সামাজিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। তবে শুধু কৃষ্ণাঙ্গ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মানুষও দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপে বসবাস করছে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এসব গোষ্ঠীর নারীরাও নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পুরুষতন্ত্রের পটভূমিতে তাঁদের জীবন কীভাবে কাটে, তা নিয়ে সাহিত্য কিংবা বিবরণধর্মী নানা লেখা লিখেছেন। ইংল্যান্ডের কালো ও এশীয় বংশোদ্ভূত নারী, ফ্রান্সের আলজেরীয় নারী, জার্মানির তুর্কী বংশোদ্ভূত নারী, সুইডেনের আরব বংশোদ্ভূত নারী— এঁদের সবাই সাংস্কৃতিকভাবে মূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকটাই অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

আফ্রিকীয়-আমেরিকান নারীবাদের ধারাতেই পরবর্তীকালে নারীবাদে তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বরের সূত্রপাত ঘটে। তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি আলাদা। এই দেশগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের মাত্রা বেশি হওয়ায় নারীর অধস্তনতাও এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি। দারিদ্র্যের কারণে সাংস্কৃতিকভাবেও এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো অনগ্রসর। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপক অশিক্ষা-কুশিক্ষার কারণে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির চাপে নারীদের এখানে সবচেয়ে বেশি নির্যাতন আর বৈষম্যের শিকার হতে হয়। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর সমাজ অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত দিক থেকেও অনেক বেশি বিভক্ত। স্বাভাবিকভাবে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের মাত্রাও এই দেশগুলোতে প্রকট। তৃতীয় বিশ্বের নারীর এই তীব্র বৈষম্যমূলক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নারীবাদীরা এই অঞ্চলের নারীদের সাংস্কৃতিকভাবে নিম্নবর্গীয় বা 'সাবঅলটার্ন' (subaltern) বলে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নবর্গীয় তত্ত্বটি মূলত ভারতের আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অর্থনীতিবিদ রণজিৎ গুহ। পরবর্তীকালে তাঁরই নেতৃত্বে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, শহীদ আমিন, গৌতম ভদ্র, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখ গড়ে তোলেন নিম্নবর্গীয় সমীক্ষণ গোষ্ঠী (subaltern studies)। নিম্নবর্গের চর্চার ধারায় গত প্রায় দুই দশক ধরে এই গোষ্ঠী প্রকাশ করে চলেছে নিম্নবর্গীয় শীর্ষক ইতিহাস গ্রন্থমালা। এরই একটা সংখ্যায় বাঙালি ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর দুটি গল্পের আলোচনার পটভূমিতে গায়ত্রী তৃতীয় বিশ্বের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রকাশিত 'অন্য পৃথিবীতে : সাংস্কৃতিক রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলি' (স্পিভাক ১৯৮৮) গ্রন্থেও তিনি নিম্নবর্গ-সংক্রান্ত ওই প্রবন্ধটি সংকলিত করেন। প্রবন্ধটিতে তৃতীয় বিশ্বের সমাজে নারী শুধু পুরুষের তুলনায় অধস্তন নয়, বরং বিশেষভাবে অন্ত্যজ, নীচুশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজের পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির দ্বারা নির্যাতিত, নিগৃহীত হচ্ছে তার বিবরণ দিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পের অনুসরণে তিনি দেখিয়েছেন, শুধু পারিবারিক বলয়ে নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আন্দোলন করলে নারীর শরীরকেই প্রধান লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। নারীর শরীর প্রায় একইসঙ্গে গণধর্ষণ আর বিকৃত অবস্থায় গণদর্শনের বিষয় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে ব্যাখ্যা করলে পশ্চিমা কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের দাস অবস্থায় শাদা প্রভুদের ধর্ষণের শিকার হওয়ার সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের নারীদের অভিজ্ঞতার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

তৃতীয় বিশ্বের নারীলেখকদের আরেক ধরনের লেখাও এই সময় নারীবাদীদের আলোচনায় বেশ প্রাধান্য পায়, আর সেটা হলো, নারীদের আত্মজীবনীমূলক রচনা। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে বলা যায়, নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী (১৯৯২) গুয়েতেমালার রিগোবের্তো মেঞ্চুর কথা। তিনি তাঁর দেশের আদিবাসী বা মূল নৃগোষ্ঠীর

অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে চলেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'আমি, রিগোবের্তো মেঞ্চু : গুয়েতেমালার ইন্ডিয়ান নারী' (মেঞ্চু ১৯৮৩) ল্যাটিন আমেরিকা ছাড়িয়ে ইউরোপ আমেরিকাতে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত হয়। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ব্রাত্য বা সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে মেঞ্চু যেমন সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন, তেমনি তাঁর রচনাও ল্যাটিন আমেরিকার সংস্কৃতিতে নারীর করুণ অবস্থার দলিল হয়ে আছে। পরে মেঞ্চু প্রকাশ করেন আরো একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'সীমানা ছাড়িয়ে' (মেঞ্চু ১৯৮৮)। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাংলাদেশের দিকে তাকালেও দেখা যাবে, আমরা এমন অনেক নারীলেখককে পেয়েছি, যাঁদের আত্মজীবনী তৃতীয় বিশ্বের নারীর সাংস্কৃতিক-পারিবারিক অবস্থা কেমন, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বাংলা ভাষায় মূলত প্রথম আত্মজীবনী রচনার পথিকৃৎ হয়ে আছেন একজন নারী— রাসসুন্দরী দেবী, তাঁর 'আমার জীবন' (১৮৭৫) গ্রন্থের জন্য। এই গ্রন্থে পারিবারিক বলয়ে নারীর ব্রাত্যজীবনের কথাই উঠে এসেছে। আবার কোন বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশে বাংলাদেশের মুসলমান নারীরা জীবনযাপন করে, পুরুষের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়, তার অসংখ্য বিবরণ আছে বেগম রোকেয়ার আত্মজীবনীমূলক রচনায়। বাঙালি নারীদের আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলো প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের অবদমনমূলক সাংস্কৃতিক পরিবেশে পুরুষের অধস্তন নির্যাতিত অবহেলিত নারীর জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ বিবরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। এই আত্মজীবনীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা', প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্বকথা', কৈলাশবাসিনী দেবীর 'জনৈক গৃহবধূর ডায়েরী', হেমন্তবালা দেবীর 'নিজের কথা', সারদাসুন্দরী দেবীর 'কেশবজননী সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা', সুধীর গুপ্তার 'আমার সেদিনের কথা', ইত্যাদি। এসব আত্মজীবনীর অধিকাংশের মূলকথা একটাই, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক বলয়ে নারীর অধস্তনতা, পুরুষ নারীকে কখনোই সমান চোখে দেখে নি, নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের সীমা এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে এতে নারীর জীবন পদে পদে বিপন্ন হয়ে পড়ে। পশ্চিমা নারীবাদীরা নারীর সঙ্গে নারীর পার্থক্য ঘুচিয়ে দেবার যে কথা বলেছেন, প্রাচ্যের, অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী লেখকদের লেখায় সে প্রসঙ্গ তেমন একটা প্রাধান্য পায় নি, তবে ভগ্নীত্বের বোধ বাঙালি নারীদের মধ্যে সক্রিয় ছিল সর্বজনীনভাবে নারী পুরুষতন্ত্রের অধস্তন থাকায়।

পশ্চিমে ১৯৮০-র দশকে নারীদের মধ্যে আবার এক ধরনের 'যৌনযুদ্ধ' বেঁধে গিয়েছিল বলে নারীবাদী ঐতিহাসিকেরা মন্তব্য করেছেন। নারীসমকামী বা লেসবীয় নারীরা এই সময় নারীত্বের পুরানো ধারণা অতিক্রম করে নারীর বহুমুখী আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। তাঁরা উগ্র যৌনাচারে জড়িয়ে পড়েন। কৃষ্ণাঙ্গ নারীরাও শ্বেতাঙ্গ নারীদের বিরুদ্ধে এই সময় অভিযোগ করতে থাকেন এই বলে যে, তাঁরা কখনোই শ্বেতাঙ্গ পুরুষের হাতে কৃষ্ণাঙ্গ নারীর নিগৃহীত হওয়ার কথা বলেন নি। উগ্র যৌনাচারের জন্য নারীসমকামীদের অনেকেই তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। নারীসমকামীদের তাঁরা শিশ্নশত্রু বলে আখ্যায়িত করেছেন (জেফরি ১৯৯৪)। তবে এসব ঘিরে, অর্থাৎ নারীসমকামী প্রবণতাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ব্যাপক মাত্রায় এর নানা সাংস্কৃতিক প্রকাশ ঘটতে থাকে। নারীসমকামকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে রচিত হয় বিপুল পরিমাণ সাহিত্য, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, চিত্রকলা, সংগীত, ইত্যাদি। যৌনইতিহাস ও সমকামিতার ইতিহাস নিয়েও অসংখ্য গবেষণা হয়েছে এই সময়। এই গবেষণাগুলোই মূলত ১৯৯০-এর দশকে এতদিন ধরে প্রচলিত গবেষণার গতিপথকে 'নারী' থেকে 'জেন্ডার'-এর দিকে ঘুরিয়ে দেয়। প্রখ্যাত নারীবাদী জুডিথ বাটলার এই প্রেক্ষাপটেই লেখেন তাঁর 'জেন্ডার সমস্যা' (বাটলার ১৯৯০) শীর্ষক বইটি, যে বইয়ের সুবাদে জেন্ডার নারীবাদীদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এবার জেন্ডার কীভাবে নারীবাদকে প্রতিস্থাপিত করেছিল, সেই প্রসঙ্গ। বলা বাহুল্য যে, পশ্চিমে নারীর সাংস্কৃতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়েই জেন্ডার ধারণাটির বিকাশ ঘটে।

## জেন্ডার ঝোঁক

নারীবাদী সাহিত্যে জেন্ডার ঝোঁকের সূত্রপাত ঘটে নারীসমকামীদের মাধ্যমে। যৌনসংস্কৃতিতে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে এর সূচনা ঘটেছিল বলা যায়। লেসবীয় বা নারীসমকামীরা মূলত পুরুষ বা নারী কোনো পরিচয়েই পরিচিত হতে চায় নি। এই নিয়েই নতুন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সুবাদে নারীবাদের ধারায় নতুন একটি তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটে। সেই তত্ত্বটিকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে কুইয়ার থিয়োরি (queer theory), বাংলায় এর পরিভাষা করা সত্যি দুরূহ। কেননা অভিধান অনুসারে কুইয়ারের বাংলা অর্থ 'অশিষ্ট সমকামী'। কিন্তু ইংরেজিতে আরো বেশ কিছু শব্দ আছে— যেমন হোমোসেক্সুয়্যাল, গে, লেসবিয়ান— এই সবগুলো ইংরেজি শব্দের

প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সমকাম'। অর্থাৎ সমকাম ছাড়া এতগুলো ইংরেজি শব্দের আর কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। অথচ এইসব ভিন্ন ভিন্ন ইংরেজি শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন, অনেকটাই আলাদা। এখানে কিছুটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা ছাড়া এই শব্দগুলোর পার্থক্য বোঝানো একেবারেই সম্ভব নয়। আমি সেই ব্যাখ্যা দেয়ারই চেষ্টা করব। কুইয়ার থিয়োরি ও গে শব্দের সঙ্গে শুধু সমকামী অনুষঙ্গ জড়িয়ে নেই, জড়িয়ে আছে যৌন-আত্মপরিচয় আর এইডসের মতো যৌনসংকটের গভীর অর্থ। এইভাবে ব্যক্তিক আত্মপরিচয়ের অর্থ ধারণ করায় কুইয়ার থিয়োরির রাজনৈতিক তাৎপর্য তাই অনস্বীকার্য। পুরুষতান্ত্রিক অধস্তনতাকে অগ্রাহ্য করার জন্য পুরুষের সঙ্গে নারী যৌনসম্পর্ক স্থাপন আর জীবনব্যাপী সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকৃতি জানায়। নারী সম্পর্ক স্থাপন করে নারীর সঙ্গে। এই সম্পর্ক, বলা বাহুল্য যে, সমলৈঙ্গিক হওয়ায় তা সমকামী হয়ে পড়ে। কুইয়ার তত্ত্বের প্রবক্তারা সমকামী এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রকে অস্বীকার করে নারী নতুন সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে বলে মনে করেছেন। কুইয়ার তত্ত্বের রাজনৈতিক তাৎপর্য মূলত এটাই। কুইয়ার তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, এখানে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> The feminist sex wars (extended debates around S/M, pornography, prostitution, butch/femme) heightened the need for an analysis of sexuality irreducible to gender. This, combined with the AIDS crisis, which serve to realign and strengthen estranged lesbian and gay ties, created a political, artistic and academic culture receptive to a notion of 'queer'. Queer theory posits a critical re-thinking or 'querying' of the ideological, psychological, and bodily economies which shape sexual identity, gender and desire (Creet 2000: 413).

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নারী যখন পুরুষতন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে নিজের আত্মপরিচয়কেই প্রাধান্য দিতে শুরু করে, সেই প্রেক্ষাপটেই জেন্ডার তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটে। নারীর যৌনবাসনাও তখন নতুন তাত্ত্বিক রূপ পায়। কুইয়ার তাত্ত্বিকেরা অবশ্য জেন্ডার তত্ত্ব ছাড়িয়ে নারী নতুন যৌন-আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করেন। এই তত্ত্বটি একই সঙ্গে লৈঙ্গিক পরিচয়, যৌনতা ও জেন্ডার পরিচয়— এসবের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। নারীবাদীরা লক্ষ করেছেন, ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে জীবপ্রযুক্তির যে বিকাশ ঘটে তার পটভূমিতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয়। সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিকেরা বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, জীবনের পরিণাম, যৌনসাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যবাদ (teleology) সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। বিশেষ করে মিশেল ফুকো ও জ্যাক দেরিদা— এই দুই উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিকের রচনাতেই এই প্রশ্নগুলো বারবার ঘুরে-ফিরে উত্থাপিত হয়েছে। তাঁদের ধারণা অনুসারে, সবকিছুর পেছনেই সক্রিয় রয়েছে সংস্কৃতি, ফলে তা পরিবর্তনযোগ্য বা রূপান্তরিত হতে পারে। এ কারণেই জীবতত্ত্ব ও শরীরের সঙ্গে যে সংস্কার, ভাবনা বা বিধিনিষেধ, যা-কিছু জড়িয়ে আছে তার সবকিছুই বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়, এসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না।

গত শতকের শেষদিকে এভাবেই কুইয়ার তত্ত্ব, জেন্ডার-ঝোঁক আর জীবতত্ত্ব সম্পর্কিত পরিবর্তিত এসব ভাবনা নারী-পুরুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে দ্বৈতবিরোধ (binary), তাকে অকার্যকর করে দেয়। এরই প্রভাবে, বলা বাহুল্য, নারীবাদী ভাবনাও তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতে থাকে। নারীসমকামিতার নতুন সাংস্কৃতিক উন্মেষের পটভূমিতে নারী-পুরুষের যৌনসাংস্কৃতিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। আবির্ভাব ঘটে নানা শ্রেণির যৌন ও জেন্ডার-অতিক্রমী (transgender) গোষ্ঠীর, যারা নারী-পুরুষের সনাতন সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে গুরুত্ব না-দিয়ে ব্যক্তিক আত্মপরিচয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন, ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই জেন্ডারের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন এইসব গোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট ভাবুকেরা।

কী পাশ্চাত্যে কী প্রাচ্যে, প্রত্যয়বাচক পরিভাষা হিসেবে জেন্ডার একটি নতুন শব্দ। পশ্চিমের ভাবুকদের কাছ থেকেই এই শব্দ বা ধারণাটি 'জেন্ডার' নামে নারীবিষয়ক আলোচনায় গৃহীত হয়। গত দুই দশক ধরে বাংলা ভাষায় ও সংস্কৃতিতে এর ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রথমে পশ্চিম বাংলার নারীগবেষকেরা এর ব্যবহার শুরু করেন, বাংলাদেশে এর অল্পস্বল্প ব্যবহার শুরু হয় আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে যখন জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) তাদের উন্নয়ন কর্মসূচিতে জেন্ডার প্রত্যয়টি গ্রহণ করে। এখন বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই পরিভাষাটির শুধু ব্যবহার নয়, এর আলোকে নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচিয়ে নারীর জীবনকে জেন্ডারবান্ধব করে তুলতে চাইছে।

## জনপ্রিয় সংস্কৃতি ও জেন্ডার

নারীসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ১৯৯০-এর দশক শুরু হয় 'ক্ষমতা' ও 'আত্মপরিচয়'— এ দু'টি বিষয়কে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ককে কেন্দ্র করে। এভাবেই এর আগের অব্যবহিত দুই দশকের নারীবাদী ভাবনায় ব্যাপক রূপান্তর আসে। অনেকের মতে, নারীবাদের প্রভাব এই সময় অনেকটা খর্ব হয় আর প্রাধান্য পেতে শুরু করে জেন্ডার। নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে যৌনতার একটা গভীর সম্পর্ক আছে বলে অনেকেই গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ফলে নব্বইয়ের দশকে নারীর ক্ষমতায়ন আর নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্কের ওপর আবার গভীর দৃষ্টি পড়ে (গ্রোজ ও প্রোবিন ১৯৯৫), পুনরুত্থান ঘটে যৌনতার। পশ্চিমা জনপ্রিয় কয়েকটি প্রতীকী নারীচরিত্র ও টেলিভিশন ধারাবাহিক— যেমন 'লারা ক্রফট', 'ভয়ানক ভ্যাম্পায়ার খুনি বাফি' নারীর ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপকে তুলে ধরতে থাকে। মার্কিন টেলিভিশনে ওই একই সময়ে শুরু হয় 'যৌনতা ও মহানগর' শীর্ষক এমন একটা ধারাবাহিক নাটক, যা প্রচারের পরপর খুব দ্রুত জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে। জনপ্রিয় পপ সংগীতশিল্পী হিসেবে ম্যাডোনারও আবির্ভাব ঘটে এই সময়। টেলিভিশনে গেরিলা যুদ্ধরত নারীর উপস্থাপনাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এভাবেই মার্কিন সমাজে সুন্দরী হয়েও নারীরা যেমন একদিকে স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন করতে পারেন, আবার অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে স্বাক্ষর রাখতে পারেন দক্ষতা আর কুশলতার, অর্জন করতে পারেন অর্থ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি— নারীর এই রূপই তখন পশ্চিমা নারীবাদী সংস্কৃতির মূল প্রবণতা হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সমীক্ষকদের মতে, নারীর শরীরী যৌনতার মনোমুগ্ধকর রূপ (দ্রষ্টব্য 'যৌনতা ও মহানগর') আর সৌন্দর্যের ভয়ঙ্কর কঠিন প্রতিমূর্তি (দ্রষ্টব্য 'লারা ক্রফট' ও 'ভয়ানক ভ্যাম্পায়ার খুনি বাফি')— এই দু'টো বিষয়ই মূলত গত শতকের নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নারীমুক্তির নতুন অর্থ দিতে শুরু করে। তাঁদের মতে, নারী-পুরুষের জেন্ডার সম্পর্ক এভাবেই ক্রমশ ভারসাম্যমূলক হয়ে উঠতে শুরু করে। এতদিন ধরে যে একরৈখিক সৌন্দর্যের সরল 'মেয়েলি' রূপ পশ্চিমা সংস্কৃতিতে চেপে বসেছিল, যে-সৌন্দর্য ছিল পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত আর বানানো, সেসব সরে গিয়ে গুরুত্ব পড়ে কর্তৃত্ববাদী বিপরীতমুখী যৌনসম্পর্কের ওপর। এই সংস্কৃতিতে নারীর সৌন্দর্য এখন আর উপেক্ষিত নয়, নারীত্বকেও অগ্রাহ্য করা হচ্ছে না। তবে নারীর সৌন্দর্য ও নারীত্ব আগে যেমন পুরুষের ইচ্ছাধীন, অধস্তন, নিষ্ক্রিয় ছিল, তখন আর সেরকমটা রইল না। নারীর ইচ্ছা আর কর্তৃত্বই প্রধান হয়ে উঠতে শুরু করল। অর্থাৎ আগে নারীর সৌন্দর্য ও যৌনতাকে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হতো, পুরুষই ছিল দর্শক ও ভোক্তা, কিন্তু গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে এ দুটি বিষয় নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনার চল শুরু হয়। নারী কী চাইছে, কীভাবে চাইছে, সেসবই প্রধান হয়ে ওঠে। সমকালীন নারীবাদীদের মতে, নতুন এই সাংস্কৃতিক অভিঘাতে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নারীর পরিসর অন্যরকম হয়ে উঠতে থাকে, যার মধ্য দিয়ে পশ্চিমা সমাজ লৈঙ্গিক পক্ষপাতিত্বের ঝোঁক থেকে অনেকটাই মুক্ত হতে পেরেছে। নারীর সনাতন 'মেয়েলিপনা'কেও এই সংস্কৃতি অগ্রাহ্য করে। গুরুত্ব পড়ে বিষম কর্তৃত্ববাদী যৌনতা ও নারীত্বের ওপর; আর এটাই ছিল মূলত ১৯৯০-এর দশকের নারীবাদী চিন্তার প্রধান উপজীব্য।

রূপান্তরিত এই সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবশ্য কোনো কোনো নারীবাদী সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, সৌন্দর্যের মুগ্ধ রূপ আর নারীত্বের ভয়ঙ্কর চেহারা নারীসংস্কৃতির পুরুষালি ভাবকেই প্রকট করেছে; এর মাধ্যমে পুরুষালি সংস্কৃতির নারীত্বায়ন ঘটে নি। এই প্রবণতার পরিবর্তে তাই যদি পুরুষালি সংস্কৃতির নারীত্বায়ন ঘটত, নারীর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো যেত, তাহলে নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা আরো ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারত (ক্যাম্পবেল ১৯৯৩)। কিন্তু তা হয় নি, বরং নারীর সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাই অনেক ক্ষেত্রে পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবু এই প্রতিক্রিয়া ছিল আসলে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল নারীদের প্রতিবাদ।

নব্বইয়ের দশকের ব্রিটিশ নাট্যকার সারাহ কেনের কথাই ধরা যাক। আত্মসত্তার (self) বিরুদ্ধে ছিল এই নারীর যত ক্ষোভ, প্রতিবাদ। ১৯৭১ সালে প্রতিভাবান কেনের জন্ম, আত্মহত্যা করেন ১৯৯৯ সালে। সমকালীন সংস্কৃতি সমালোচকেরা বলছেন, তাঁর লেখা নারীর না পুরুষের সেই ভেদচিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সহিংসতা, আগ্রাসন, পারিবারিক ভাঙন, সম্প্রদায়গত হানাহানি, ক্ষমতার জন্য সংঘাত, আধিপত্য, অবমাননা— নারীর ওপর পুরুষের দ্বারা, পুরুষের ওপর নারীর দ্বারা, পুরুষের ওপর পুরুষের দ্বারা, নারীর ওপর নারীর দ্বারা— সব শ্রেণির মানুষের দ্বারাই যে মানুষের আত্মসত্তা নির্জিত-নিগৃহীত হয়, তার বহুমুখী রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন মাত্র পাঁচ বছরের পরিসরে (১৯৯৫-১৯৯৯) লেখা পাঁচটি নাটক আর একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের

মাধ্যমে। নারীরাও যে পুরুষের বিরুদ্ধে সহিংস হয়ে উঠতে পারে, তার সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইরাকের আবু গরিফের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মার্কিন নারীসেনা লিন্ডি ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড আবু গরিফের বন্দিশিবিরে আটক ইরাকি পুরুষ যুদ্ধবন্দিদের ওপর যৌননির্যাতন চালিয়ে বিশ্বজুড়ে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন। একজন নারীসেনার বিকৃতির এই বহিঃপ্রকাশ, নারীবাদীরা বলছেন, নারীবাদকে অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে (এরেনরিখ ২০০৪, এন্ডা ২০০৪)। অনেকেই এসব ঘটনাকে চিহ্নিত করেছেন 'উত্তর-নারীবাদী' (Postfeminism) কর্মকাণ্ড বলে, যা মূল নারীবাদী সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে বেমানান, কোনোক্রমেই খাপ খায় না। গত শতকের নব্বইয়ের দশকের পশ্চিমা নারীবাদী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এভাবেই চিন্তার একটা রূপান্তর আসন্ন হয়ে ওঠে, আর তা হলো, নারীবাদের প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটে উত্তর-নারীবাদী ভাবনার, যেমনটা ঘটেছিল আধুনিকতার পর উত্তর-আধুনিকতার। সুসান ফালুদি (১৯৯২) ও মেরিলিন ফ্রেঞ্চ (১৯৯২) উত্তর-নারীবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের লেখা দুটি গ্রন্থে। বলা বাহুল্য, উত্তর-আধুনিকতার মতো উত্তর-নারীবাদ নিয়েও এখন পশ্চিমা চিন্তাজগতে বিতর্ক হচ্ছে (কোপোক, হেইডন ও রিখটার ১৯৯৫, মডলেস্কি ১৯৯১)। তবে উত্তর-নারীবাদের প্রেক্ষাপটে নাওমি উল্‌ফ্‌ (১৯৯১) যেমন বলেছেন, উদ্ভব ঘটেছে নতুন এক ধরনের বিষম যৌনভাবনার। তাঁর মতে, ভোগবাদ আর ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে ব্যক্তিক আত্মসত্তা ও আত্মপরিচয় জড়িয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে এক নতুন অবস্থার। এরই প্রেক্ষাপটে আবির্ভাব ঘটেছে উল্লিখিত যৌনভাবনার। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন :

> When, in my travels, I asked women who hated the word 'feminism' to describe to me a version of feminism that could capture their aspirations, they replied with striking unanimity, 'That Nike ad. You know–"Just do it."' (The phrase that was most often quoted by 'insider' feminists, in contrast, was Audre Lorde's quote about the master's house.) (Wolf 1994: 49)

১৯৭০-এর দশকের পর ইউরো-মার্কিন দেশগুলোতে এভাবেই বদলে গেছে নারীর সাংস্কৃতিক অবস্থান। নারীরা তখন থেকে ওই দেশগুলোতে অনেক বেশি সংখ্যায় শিক্ষা ও শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ পান। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আর গর্ভপাতের মাধ্যমে তারা তাদের প্রজননের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। শুধু প্রজনন নয়, বিয়ে বিচ্ছেদ আর নিজের পছন্দের পুরুষের সঙ্গে বা সমলিঙ্গের নারীর সঙ্গে সমকামী জীবনযাপনের স্বাধীনতা লাভ করবার ফলে নিজের শরীরের ওপরও নারীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে তরুণীরা, গত শতকের আশির দশক থেকে এই ধরনের জীবন বেছে নেওয়া আর তা যাপনের সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা ভেবেছেন, সাংস্কৃতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে এখন নারী-পুরুষের আরো বেশি সমঅধিকারের সময়, নারীর জীবন এখন নারীরই। নারী যেভাবে চাইবে সেভাবেই সে তার জীবন 'বেছে নিতে' পারে, নাওমি উল্‌ফের উদ্ধৃতি অনুসারে— "নাইকির (বিখ্যাত মার্কিন স্পোর্টস কোম্পানি) বিজ্ঞাপন দেখছেন না— যা ইচ্ছে করুন।" ভোগবাদী পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ভোগ্যপণ্য বাছাইয়ের মতো নারী গত শতকের শেষ দু-তিন দশক থেকে তার ইচ্ছেমতো জীবন বেছে নিতে শুরু করে।

## জেন্ডার, শরীর ও প্রযুক্তি

'যেমন ইচ্ছে বেছে নেওয়ার জীবন'কে ঘিরে নারীবাদীদের মধ্যে ১৯৯০-এর দশকে সূত্রপাত ঘটে নতুন সাংস্কৃতিক বিতর্কের। এই বিতর্কের কেন্দ্রে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়, সেগুলো ছিল জেন্ডার, শরীর ও প্রযুক্তি। নারীবাদীদের অনেকেই নারীবাদের স্থলে ব্যবহার করতে থাকেন 'জেন্ডার' পরিভাষা বা প্রত্যয়টি। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধে 'নারী' শব্দটি ব্যবহার করে যে 'বিশেষ' ধারণার প্রকাশ ঘটানো হয়, সেই ধারণাটি পুরোপুরি পুরুষতান্ত্রিক বলে মনে করেছেন এই নারীবাদীরা। ফলে তাঁরা 'নারী' শব্দটা ব্যবহার না-করবার নতুন ভাবনা থেকে 'জেন্ডার' শব্দের ব্যবহার করা শুরু করেন। জেন্ডারের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের বহুমুখী সম্পর্ককে বোঝা যাবে বলে তাঁরা এই শব্দটির ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 'জেন্ডার' পরিভাষা বা তত্ত্বের সূত্রপাতের এটাই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

বলা প্রয়োজন, মানবভাবনার ক্ষেত্রে 'জেন্ডার' শব্দটি এভাবেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক বোঝাতে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত 'নারীবাদ' শব্দের জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ নারীভাবনার সঙ্গে যুক্ত শব্দ বা পরিভাষার উৎসই গেছে বদলে। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক-বিভাজনই মূলকথা, অধিকাংশ নারীভাবুক এরপর থেকে এরকমটাই চিন্তা করতে শুরু করেন। এরই প্রভাবে এই সময় তৈরি হয় একঝাঁক লৈঙ্গিক বিভাজন সম্পর্কিত

চলচ্চিত্র, যার অধিকাংশই নির্মাণ করেন নারী চলচ্চিত্রকারেরা। লৈঙ্গিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। চলচ্চিত্রের মতো গণমাধ্যমেও যে নারীনির্মাতারা প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন, এই প্রবণতা থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। লৈঙ্গিক সম্পর্ক নতুনভাবে নির্মাণের ইচ্ছে থেকে এই সময়ে দু'বার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পাওয়া হিস্পানি চলচ্চিত্র নির্মাতা পেড্রো আলমোদোভা নির্মাণ করেন 'মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার মুহূর্তে নারী', 'হাই হিল্‌স্', 'জীবন্ত মাংস', 'আমার মা সম্পর্কে যত কিছু', 'নারীর সঙ্গে কথা বলো' ইত্যাদি চলচ্চিত্র। এছাড়া পল বোগার্টের 'টর্চসং ত্রয়ী' শীর্ষক চলচ্চিত্র আর ব্রিটিশ নাট্যকার ক্লেয়ার ডোয়ীর তৈরি একোক্তিমূলক নাটকও (ডোয়ী ১৯৯৬) এই সময় লৈঙ্গিক সম্পর্ক উন্মোচনে নতুনভাবে আলোকপাত করে। এসব সৃষ্টিশীল কাজ গত এক দশক ধরে পশ্চিমা মানবীবিদ্যায় পঠনপাঠনের অংশ হয়ে গেছে। ডোয়ীর প্রভাবে কি না জানি না— শাঁওলী মিত্র লিখেছেন ভারতীয় পুরাণনির্ভর 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটক। এতে তিনি একক অভিনয়ও করেছেন। বাংলাদেশে ফেরদৌসী মজুমদার অভিনয় করেছেন আবদুল্লাহ আল মামুনের লেখা এরকমই একটা একোক্তিমূলক নাটক 'কোকিলারা'য়।

নারীর জায়গায় জেন্ডার শব্দটির প্রতিস্থাপন, আগেই বলেছি, নারী-পুরুষের সম্পর্ক যে সমান হয়ে উঠতে শুরু করেছে তার ইঙ্গিত দেয়। শুধু অ্যাকাডেমিক স্তর বা চিন্তাবিদদের মধ্যে নয়, পশ্চিমা জনপ্রিয় সংস্কৃতিতেও এর ঢেউ এসে লাগে। নারী ও পুরুষের সম্পর্ক এখন সমানভাবে সহিংস আর যৌনাকাঙ্ক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই গত শতকের আশির দশকে জনপ্রিয়তা পায় একাধিক ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য মনোনীত অ্যাড্রিয়ান লিন পরিচালিত 'মারাত্মক আকর্ষণ' (Fatal Attraction) শীর্ষক মার্কিন চলচ্চিত্র আর 'যৌনতা ও মহানগর' শীর্ষক মার্কিন টেলিভিশন ধারাবাহিকটি। আসলে উল্লিখিত ছবি ও ধারাবাহিকটিতে যা দেখানো হয়েছে, তা হলো, নারী এখনো গভীরভাবে বিষম যৌনসম্পর্কের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, যদিও কীভাবে সেই সম্পর্ক সহজ করে তোলা যায়, দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সমাজে বসবাসরত নারী বা পুরুষ সেই সংকট দূর করতে পারছে না।

তবে গত শতকের ১৯৯০-এর দশকে পশ্চিমের সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যাকে 'সাংস্কৃতিক বাঁক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। নারীবাদী চিন্তার বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই বাঁকটিকেই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়; আর সেটা হলো, পশ্চিমা সমাজে প্রকৃত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের 'সাংস্কৃতায়ন' (culturalization) ঘটে গেছে। জীবপ্রযুক্তি ও জীনপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সরাসরি এই সময় মানুষের জীবনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে এই উন্নয়ন খাদ্যসংকট দূর করতে সাহায্য করে। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। প্রজননের ক্ষেত্রেও বিশ্বজুড়ে ব্যাপক রূপান্তরের সূচনা ঘটে।

প্রযুক্তির এই সাংস্কৃতায়ন নারীবাদী ভাবনাকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। 'শরীর' সম্পর্কে শুরু হয় ব্যাপক গবেষণা ও লেখালেখি। মানবীবিদ্যা চর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে এক কথায় বলতে গেলে গত শতকের শেষ দশকটি ছিল মূলত 'শরীরের দশক'। মানবীয় চিন্তাজগতে মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব নিয়ে এর আগে আর কখনো এতটা আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি, যতটা হয়েছিল এই সময়। নারীর শরীর নারীবাদের কেন্দ্রে চলে আসায় চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন করে নারীর শরীর নিয়ে দেখা দেয় তীব্র অস্থিতিশীলতা। টেস্টটিউব শিশুর জন্ম নিয়ে নারীবাদীরা তীব্র আপত্তি জানান। প্রযুক্তিনির্ভর এই প্রজনন পদ্ধতির কারণে প্রজননের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেছেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এই সময় নির্মিত হয় বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র, লেখা হয় উপন্যাস ও ছোটগল্প। টেলিভিশনেও প্রচারিত হতে থাকে নানা ধরনের অনুষ্ঠান। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সাংস্কৃতিক সমস্ত মনোযোগ এই সময় নারীর শরীরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। নারীবাদীরা শরীরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। বেশিরভাগ নারীবাদী, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ আর সাংস্কৃতিক সমীক্ষক ভেবেছেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে নারীর জৈবিক সত্তা সম্পর্কে নতুন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এখনো এ নিয়ে নানা ধরনের লেখালেখি হচ্ছে আর বিতর্ক চলছে।

প্রযুক্তির এই বিকাশের ফলে 'একান্ত নিজস্ব' বলে নারীশরীরের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে নি বলে নারীবাদীদের ধারণা। নারীর শরীর এখন তাই আর নারীর আত্মগত নিজস্ব কোনো বিষয় নয়, তা প্রযুক্তির সাহায্যে বদলে ফেলে 'নির্মাণ করা' যায় অথবা 'অর্জন করা' যায়। নারীবাদীরা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করেন প্রযুক্তির সাহায্যে শারীরিক রূপান্তরের (প্লাস্টিক সার্জারি) প্রসঙ্গটি। নারীর শরীরকে এভাবে কৃত্রিম উপায়ে বদলে ফেলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন নারীবাদীরা (ডেভিস ১৯৯৫, ২০০৩)। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন, এর ফলে নারী আর নারী থাকে নি, তার অস্তিত্ব আবার পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পুরুষ

সুন্দর মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠব দেখতে চায় আর নারী কসমেটিক সার্জারির মাধ্যমে সেভাবেই নিজেকে রূপান্তরিত করে পুরুষের কামনা-বাসনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। নারী তার প্রকৃত রূপকে কেন পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য এভাবে বদলে ফেলবে, নারীবাদীদের আপত্তি ছিল মূলত এটাই। তাঁরা মনে করেছেন, যেসব নারী এই কৃত্রিম রূপসৃষ্টির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছেন, তারা মূলত পুরুষতন্ত্রকেই স্বীকার করে নিয়ে পুরুষের কামনার বস্তুতে পরিণত হয়েছেন। বিসর্জন দিয়েছেন তাদের আত্মসত্তাকে। আত্মসত্তার এই বিসর্জন পুরুষের কাছে নারীর পরাজয়কেই সামনে নিয়ে আসে। শুধু এই আত্মনিগ্রহ নয়, নারীবাদীরা এই প্রশ্নও তুলেছেন যে নারীর সাংস্কৃতিক এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীর গোষ্ঠীগত ও বর্ণগত সমস্যাকেও আবার প্রকট করে তুলবার ইন্ধন জোগানো হয়েছে। যেমন কালো গাত্রবর্ণের নারীর তুলনায় শ্বেতাঙ্গ নারীই এই সময় হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের প্রতীক, পুরুষের অধিক কামনার বস্তু। এর ফলে 'নারী যা সেটাই তার অস্তিত্ব'— এই ধারণাটি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি শারীরিক নীতিবোধও বদলে গেছে। এসবই প্রকৃতপক্ষে নারীমুক্তির অন্তরায় বলে নারীবাদীরা প্রযুক্তির সাহায্যে নারীর শারীরিক রূপান্তরের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নারীবাদী সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পীরা এর বিরুদ্ধে যে কী তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তার পরিচয় মেলে ফরাসি কবি ও চিত্রশিল্পী ওরলানের সার্জারির মাধ্যমে নিজের শরীরকে বদলে ফেলে জীবন্ত শিল্পকর্ম হিসেবে নিজের শরীর প্রদর্শনের মধ্যে। ওরলানের আগে নিজের শরীরকে প্রদর্শন শিল্পকর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, এমন চিন্তা কারো মাথায় আসে নি। এই ধারণাটি ছিল সত্যি অভিনব। কীভাবে ওরলান নিজেকে সাংস্কৃতিক শিল্পকর্মে পরিণত করেছেন, এখানে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করছি। ওরলান ফরাসি একজন চিত্রশিল্পী ও কবি, বাস্তবের রক্তমাংসের এক নারী। কিন্তু তিনি শল্যপ্রযুক্তির সাহায্যে নিজের শরীরকে বারবার বদলে ফেলেন আর সেই বদলে ফেলা শরীরকে উপস্থাপন করেন এক-একটা 'শিল্পকর্ম' হিসেবে। অর্থাৎ নিজের পরিবর্তিত শরীরকেই ওরলান শিল্পবস্তু হিসেবে প্রদর্শনের বিষয় করে তুলেছেন। ওরলান বলেছেন, তিনি নিজের শরীরকে শিল্পের আঙ্গিকে রূপান্তরিত করে নিয়ে তারপর সেই শরীরকে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে বারবার শল্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বদলে ফেলা তাঁর রূপান্তরিত শরীরই হচ্ছে শিল্প। শিল্পের এই ধারণাটি অভিনব তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নারীশরীরকে পুরুষের চোখে মনোমুগ্ধকরভাবে উপস্থাপনার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, ওরলান তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি নিজের শরীরকে পুরুষের দৃষ্টিতে মোহনীয় বা আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেন নি, বরং তাঁকে নারীঅস্তিত্বের স্মারক করে তুলেছেন। ওরলানের এই শরীরী শিল্পকর্মগুলো তিনি গত শতকের শেষ দশকে নিজের দেশ ফ্রান্সসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনীগুলো টেলিভিশন নেটওয়ার্কে সরাসরি দেখানো হয়েছে। এই লক্ষ্যে তিনি স্থাপন করেছেন নিজের একটা মাল্টিমিডিয়া সেন্টার। নিজের পরিবর্তিত শরীরের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, 'এই হচ্ছে আমার শরীর, এটাই আমার সফটওয়্যার, একে দেখো।'

নারীর শরীর বদলে ফেলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নারীবাদীদের মধ্যে সূত্রপাত ঘটে প্রবল সাংস্কৃতিক বিতর্কের। কোনো কোনো নারীবাদী ব্যাখ্যা করে বলেছেন, শারীরিক রূপান্তরের এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে বোঝা যায়, পুরুষ নারীকে যে-রূপে দেখতে চায়, নারী যেন সেভাবেই নিজেকে বদলে নিচ্ছে। এটা হচ্ছে যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে নারীর শরীর ব্যবহারের আরেকটা দৃষ্টান্ত। পুরুষের চোখে মোহনীয় হয়ে থাকার জন্য নারী তার শরীরের আকার যেভাবে ডায়েট করে ফিটনেসের নামে ঠিক রাখে, যাতে নারীর স্বাস্থ্যই প্রকারান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সার্জারির মাধ্যমে ওরলানের শরীরকে বদলে ফেলাও সেরকমই একটা কাজ। নারীবাদী মতাদর্শের দিক থেকেও এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা এর মাধ্যমে নারী পুরুষের চোখে যৌনপণ্যে পরিণত হয়, সমমর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কিন্তু এই সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে বিরুদ্ধ নারীবাদীরা বলেছেন, নারী এখন নিজেই নিজের শরীর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। নারীশরীরের রূপ কী দাঁড়াবে তা আর পুরুষের ইচ্ছাধীন নয়, নারী নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তার শরীরের আকার ঠিক রাখতে পারে। ওরলান ঠিক সেটাই করে চলেছেন।

ওরলানের শরীর পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারটাই প্রতিষ্ঠা পায় যে একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারীর শরীর আরো নানাভাবে বদলে ফেলার আয়োজন চলবে। এই মুহূর্তে নারীর শারীরিক রূপান্তর সাধনের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারই নারীবাদ, জেন্ডার সমীক্ষা আর মানবীবিদ্যা চর্চার প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাংস্কৃতিকভাবে লৈঙ্গিক সম্পর্ক নির্ধারণে কী ভূমিকা পালন করে, নারীবাদীরা গত এক দশক ধরে এই বিষয়টার ওপরই সবচেয়ে বেশি আলোকপাত করছেন, লিখছেন অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ। নারীবাদীরা বলছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে লিঙ্গনিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করতে হবে, লৈঙ্গিক

বিভাজন আর নারী অধস্তনতার জন্য একে ব্যবহার করা যাবে না। তাঁরা বারবার আহ্বান জানিয়েছেন, নারীদেরও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাতে নারী অবদমনের বা অমর্যাদার হাতিয়ার হয়ে না ওঠে, এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন ডোনা হারাওয়ে ১৯৮৫ সালে লেখা 'একটি সাইবোর্গ ইস্তেহার' (হারাওয়ে ১৯৯১) শীর্ষক প্রবন্ধে। সাংস্কৃতিক চিন্তার দিক থেকে হারাওয়ের প্রবন্ধটি ছিল সত্যিকার অর্থেই দিকনির্দেশক যুগান্তকারী প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি সমকালীন নারীবাদকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সাইবোর্গের বাংলা পরিভাষা করা দুরূহ। শব্দটি এসেছে সাইবারনেটিক্স থেকে। মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্কই সাইবোর্গের মূল বিষয়বস্তু। সাইবোর্গ সেদিক থেকে প্রযুক্তির সমার্থক। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে যেমন দেখা যায় মানুষের পুরো শরীর বা শরীরের অংশবিশেষকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে রূপান্তরিত করে ফেলা হয়, তখন ওই মানুষ আর সাধারণ মানুষ থাকে না, হয়ে ওঠে অনেক ক্ষমতাবান; হারাওয়ে বলছেন, এটাই সাইবোর্গ। হারাওয়ের মতে এই সাইবোর্গের ব্যবহার এখন সর্বত্রই ঘটছে— আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে শুরু করে তথ্যপ্রযুক্তি পর্যন্ত, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি থেকে দৈনন্দিন জীবনযাপন পর্যন্ত। এটাই এখনকার সমাজ বাস্তবতা। কিন্তু এই সাইবোর্গকে নারীবান্ধব বা জেন্ডারবান্ধব করে তোলাটাই হওয়া উচিত এখনকার নারীবাদী সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। হারাওয়ে প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা সেক্যুলার মানবতাবাদ আর চরমপন্থী নারীবাদের প্রেক্ষাপটে সমাজবাদী মতাদর্শের প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধটি লেখেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পদ্ধতি হিসেবে কীভাবে পৃথিবীকে নির্মাণ করছে, কীভাবে মানুষের আত্মপরিচয় আর ভবিষ্যৎ গঠন করে চলেছে, হারাওয়ে সেই দিকে নারীবাদী ও দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হারাওয়ে লিখেছেন সাইবোর্গ ও মানুষের সম্পর্ক, বিশেষ করে নারীর সঙ্গে সাইবোর্গের সম্পর্কের মাত্রাটি বেশ স্পর্শকাতর একটা ব্যাপার হয়ে উঠছে। কেননা এর মাধ্যমে বদলে যাচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, বদলে ফেলা হচ্ছে নারীর শরীর, বদলে যাচ্ছে নারী-পুরুষের শারীরিক-সামাজিক সম্পর্কের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত। ফলে সাইবোর্গের দিকে নারীবাদীদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অস্বীকার করে বা পাশ কাটিয়ে নয়, একে নির্মাণ ও ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নারীর আত্মপরিচয়, নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক সম্পর্কের নতুন অবস্থান তৈরি করা যেতে পারে। তিনি এভাবেই প্রতীকী অর্থে হয়ে উঠতে চেয়েছেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভাবসঞ্চারী সাইবোর্গের নতুন দেবী। হারাওয়ের নিজের ভাষায় :

> Cyborg imagery can help express two crucial arguments in this essay: first, the production of universal, totalizing theory is a major mistake that misses most of reality, probably always, but certainly now; and second, taking responsibility for the social relations of science and technology means refusing an anti-science metaphysics, a demonology of technology, and so means embracing the skilful task of reconstructing the boundaries of daily life, in partial connection with others, in communication with all of our parts. It is not just that science and technology are possible means of great human satisfaction, as well as a matrix of complex dominations. Cyborg imagery can suggest a way out of the maze of dualisms in which we have explained our bodies and our tools to ourselves. This is a dream not of a common language, but of a powerful infidel heteroglossia. It is an imagination of a feminist speaking in tongues to strike fear into the circuits of the supersavers of the new right. It means both building and destroying machines, identities, categories, relationships, space stories. Though both are bound in the spiral dance, I would rather be a cyborg than a goddess. (Haraway 1991: 181)

সাম্প্রতিক কালে অনেকটা হারাওয়ের ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটিয়েই সমকালীন নারীবাদীরা প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর জীবন ও শরীর কীভাবে বদলে গিয়ে তার আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হচ্ছে, সেই বিষয়টির ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। তাঁরা নারীশরীরের ক্ষেত্রে কোনটা 'স্বাভাবিক' আর কোনটা 'অস্বাভাবিক' তার সীমারেখা নির্দেশ করে নারীর শরীরী সংকটের সঙ্গে সঙ্গে যেন আত্মসত্তার সংকট তৈরি না হয়, সেদিকে নারীদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। নারীবাদীদের সাম্প্রতিক 'প্রযুক্তির পাঠে' নতুন করে যুক্ত হয়েছে কম্পিউটার প্রযুক্তি বা সাইবারস্পেসের বিষয়টি। সমকালীন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে বদলে দিয়ে লৈঙ্গিক পরিচয় আর 'উত্তর-মানব' (post-human) শরীর নির্মাণে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে বলে নারীবাদীরা মনে করেন (স্টোন ১৯৯৬, উলমার্ক ১৯৯৯)। এই সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, বলা বাহুল্য, শুধু নারীর শরীরকে ঘিরে

সত্তাতাত্ত্বিক সংকটের জন্ম দিচ্ছে না, নারী-পুরুষের সম্পর্কের সম্পূর্ণ কাঠামোকেই বদলে ফেলছে। এরই প্রেক্ষাপটে লৈঙ্গিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন আরো একটি তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে, গেয়র্গ দরস্কি যার নাম দিয়েছেন 'উত্তর-লিঙ্গবাদ' (Postgenderism)।

## তৃতীয় বিশ্বের লৈঙ্গিক সংস্কৃতি

সাংস্কৃতিক সমীক্ষকদের ধারণা, লৈঙ্গিক সংস্কৃতির সাম্প্রতিক রূপান্তরের ফলে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে জেন্ডার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে অনেক। ইউরোপ ও আমেরিকা তো বটেই, পৃথিবীর সব দেশের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীঅধ্যয়ন এখন একটা অনিবার্য পঠিত বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে অনুন্নত বিশ্বের বা কম উন্নত দেশগুলোর জেন্ডার বিষয়ে পঠনপাঠনের একটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই দুই অঞ্চলের নারীদের নারীঅধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলাদা হওয়ায় জেন্ডার অধ্যয়নের বিষয়বস্তুতেও পার্থক্য ঘটছে। লৈঙ্গিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট ভিন্ন হওয়ার ফলেই এমনটা ঘটছে বলে মনে করেন জেন্ডার অধ্যয়নের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞ ও লেখকেরা। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ব্যাংককের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির জেন্ডার অধ্যয়ন বিভাগের নামকরণ করা হয়েছে 'জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ'। বিভাগের এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, জেন্ডারকে এই প্রতিষ্ঠানটির নীতিনির্ধারকেরা সরাসরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন। বিভাগটিতে জেন্ডার পঠনপাঠনের লক্ষ্য হচ্ছে, তাঁদের কথায়, "বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার পেশাগত ক্ষেত্রে এশীয় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, যাতে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের প্রবেশাধিকার ঘটে, কর্তৃত্ব অর্জিত হয় আর প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণে নারীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন" (গ্রিফিন ২০০২)। লক্ষণীয়, এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মূলকথা হচ্ছে, জেন্ডার শিক্ষার মাধ্যমে নতুন এক ধরনের শাসক এলিট শ্রেণি সৃষ্টি করা, যারা পেশাগত ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক-সামাজিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের জীবনের বস্তুগত উন্নয়ন ঘটাবেন। পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর সমস্যা আসলে এরকমই। জীবনের বস্তুগত সম্পদের ওপর এই অঞ্চলের নারীদের তেমন কোনো অধিকার বা প্রবেশাধিকার নেই। সাংস্কৃতিকভাবেই নারীরা এই পশ্চাৎপদতার শিকার। কিন্তু বিশ্বায়ন বা আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উন্নত দেশের নারীরা কীভাবে তাদের জীবনমান উন্নত করে তুলতে পারেন, কীভাবে বস্তুগত সম্পদের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, ১৯৮০-র দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সে সম্পর্কে নানা আয়োজন চলছে। প্রধানত জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই নারীদের সাংস্কৃতিক-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবার পাশাপাশি বাস্তব অবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা এই লক্ষ্যেই ঘোষণা করে, "নারী সম্পদবিশেষ।" তাদের মতে, অনুন্নত দেশগুলোর যদি উন্নয়ন ঘটাতে হয়, তাহলে নারীকেও উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাংস্কৃতিকভাবে যেমন মনে করা হয় "নারী সমাজের বোঝা"— এই ধারণা ভেঙে দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তাই লক্ষ্য হচ্ছে, সম্পদ হিসেবে অনুন্নত দেশের নারীদের ব্যবহার করে যতটা সম্ভব সম্পদশালী করে তুলতে হবে, আর তাহলেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

পক্ষান্তরে, ইউরোপ ও আমেরিকায় এই লক্ষ্য এখন অনেকটাই অগ্রাহ্য করা হয়। ইউরো-মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেন্ডার পঠনপাঠন বা লৈঙ্গিক কর্মসূচি এরকম নয়। নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক সম্পর্ককে যাতে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে বোঝা যায়, সেই লক্ষ্যেই সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জেন্ডার বিষয়টি পাঠদান করা হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা এখানে আমেরিকার প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় 'ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকগুলো উল্লেখ করতে পারি :

> Drawing on thirty years of scholarly work centered on gender analysis as well as research in many traditional fields, the program explores questions such as how women and men learn their gender roles; how different societies define women and men; and how ideas of sex and gender shape and are shaped by language, individual behavior, and social institutions such as law, religion, and education. Students explore the varied roles gender has played in different cultures, times, intellectual disciplines, and forms of creative expression. Debates over sexuality, reproduction, feminism, masculinity, the roles of women in history, politics, and

> science, and the intersections of gender with other social categories such as race, class, ethnicity are all topics addressed within this interdisiplinary field. (MIT 2006)

লক্ষণীয়, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সমগ্র সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করে আন্তরবিষয় (interdisciplinary) হিসেবে উন্নত দেশগুলোতে জেন্ডার পাঠ দেওয়া হয়। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে সামগ্রিকভাবে বোঝার জন্যই এই পঠনপাঠন। তবে অনুন্নত দেশের নারীঅধ্যয়নের দিকটি বিষয়ের দিক থেকেই যে স্বতন্ত্র মনোযোগের দাবি রাখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবীবিদ্যা পাঠদানের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয়-মার্কিনী নারীবাদী চন্দ্রা তলাপাড়ে মোহান্তির 'সীমান্তহীন নারীবাদ' (মোহান্তি ২০০৩) গ্রন্থে প্রতিফলিত বিশেষ নারীবাদী দৃষ্টিকোণটি লক্ষ করলেই তা বোঝা যাবে। চন্দ্রা তাঁর পাঠকদের জানাচ্ছেন, নানাভাবে নারী ঘৃণা আর সহিংসতার শিকার। কিন্তু সেই সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই আমাদের জীবন জাতীয়তাবাদ ও পুঁজিবাদের ভোগবাদী সংস্কৃতির দ্বারা যেভাবে সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের অবস্থান নিতে হবে পুঁজিবাদের বিপক্ষে আর মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈশ্বিক সংহতি ও বিউনিবেশীকরণের পক্ষে। ফলে চন্দ্রা জানাচ্ছেন, তিনি যে নারীবাদী কাঠামোর কথা ভাবেন, সেই নারীবাদ হচ্ছে বর্ণবাদবিরোধী নারীবাদ, যার মূলকথা হচ্ছে বিউপনিবেশীকরণ ঘটানো আর পুঁজিবাদের বিরোধিতা করা। কিন্তু এখানেই এই নারীবাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে না, নারী-পুরুষের মুক্ত সৃষ্টিশীল নিরাপদ জীবনযাপন পর্যন্ত তা প্রসারিত থাকবে। চন্দ্রার ভাষায় :

> Here is a bare-bones description of my own feminist vision: this is a vision of the world that is pro-sex and -woman, a world where women and men are free to live creative lives, in security and with bodily health and integrity, where they are free to choose whom they love, and whom they set up house with, and whether they want to have or not have children; a world where pleasure rather than just duty and drudgery determine our choices, where free and imaginative exploration of the mind is fundamental right; a vision in which economic stability, ecological sustainability, racial equality, and the redistribution of wealth form the material basis of people's well-being. Finally, my vision is one in which democratic and socialist practices and institutions provide the conditions for public participation and decision making for people regardless of economic and social location. (Mohanty 2003: 3-4)

চন্দ্রা মোহান্তির উল্লিখিত নারীবাদী ভাবনা, কোনো সন্দেহ নেই, স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে একই সঙ্গে নারী-পুরুষের রাজনৈতিক জীবন, সৃষ্টিশীলতা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, মৌলিক অধিকার, বর্ণগত সমঅধিকার, সম্পদের পুনর্বণ্টন, বস্তুজীবনের কল্যাণচিন্তা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রাণিত। অনুন্নত দেশের সাংস্কৃতিক পরিসর এভাবেই অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়ে চন্দ্রা নারীবাদ সম্পর্কে যা ভেবেছেন, সেটাই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আমাদের কাছে। আমাদের মতো অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের নারী-পুরুষের সম্পর্ক আসলে উল্লিখিত নানা সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রপঞ্চের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। সাংস্কৃতিক এই আবর্তনকেই, চন্দ্রা যেমন বলেছেন, ইতিবাচক করে তুলবার মধ্য দিয়েই তৃতীয় বিশ্বে নারীমুক্তির পতাকাটি উড্ডীন হতে পারে। পশ্চিমা আধিপত্যবাদী নারীবাদী ধারণাকে অগ্রাহ্য করে উত্তর-উপনিবেশবাদী নারীবাদী চন্দ্রা তলাপাড়ে মোহান্তি সেই ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, যা আমাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

মাসুদুজ্জামান অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। masud11111@gmail.com

## তথ্যনির্দেশ


- Butler, Judith (1990) *Gender Trouble*, London: Routledge.
- Campbel, Beatrix (1993), *Goliath: Britain's Dangerous Places*, London: Methuen.
- Cardinal, Marie (1975, repr. 1983) *The Words to Say It*, London: Picador.
- Churchill, Caryl (1982) *Top Girl*, Lodon: Methuen.

- Cixous, Hélène (1981) The Laugh of Medusa, in Elaine Marks and Isabelle de Courtivron (eds.), *New French Feminisms*, Brighton, Harvester Press, pp. 245-64.
- Coppock, Vicki, Deena Haydon and Ingrid Richter (1995) *The Illusions of Post-Feminism*, London: Taylor and Francis.
- Creet, Julia (2000) Queer Theory, in *Encyclopedia of Feminist Theories*, edited by Lorraine Code, London and New York: Routledge.
- Davis, Kathy (1995) *Reshaping The Female Body*, New York: Routledge.
- Davis, Kathy (2003) Surgical Passing, *Feminist Theory 4*, pp. 73-92.
- Dowie, Claire (1996), *Why is John Lennon Wearing a Skirt? And Other Stand-up Theatre Plays*, London: Methuen.
- Ehrenreich, Barbara (2004) Feminism's Assumptions Upended, *Los Angeles Times*, 16 May, http://www.latimes.com
- Elgin, Suzette Haden (1984) *Native Tongue*, New York: Daw Books.
- Enda, Jodi (2004) Female Face of Abuse Provokes Shock, *Women's Enews*, 10 May, http://www.womensenews.org/article.cfm?aid=1828
- Faludi, Susan (1992) *Backlash: The Undeclared War Against Women*, London: Chatto and Windus.
- French, Marilyn (1992) *The War Against Women*, London: Hamish Hamilton.
- Friedan, Betty (1963) *The Feminine Mystique*, Hasmondsworth: Penguine.
- Frye, Marilyn (1990) Wilful Virgin or Do You Have to Be a Lesbian to Be a Feminist?, in M. Frye, *Wilful Virgin*, Freedom, CA: The Crossing Press.
- Galloway, Janice (1989) *The Trick is to Keep Breathing*, London: Minerva.
- Gearhart, Sally Miller (1980) *The Wanderground*, Wetertown, MA: Persephone Press.
- Gilbert, Sandra M. and Susan Gubar (1979) *The Madwoman in the Attic*, New Haven, CT: Yale University Press.
- Gilman, Charlotte Perkins (1892, repr. 1981) The Yellow Wallpaper, in A. J. Lane (ed.) *The Charlotte Perkins Gilman Reader*, London: Women's Press.
- Griffin, Gabriele (2002) Co-operation or Transformation? Women's and Gender Studies Worldwide, in Heike Flessner and Lydia Potts (eds.), *Societies in Transition – Challenges to Women;s and Gender Studies*, Opladen: Leske and Budrich, pp. 13-32.
- Grimshaw, Jean (1986) *Feminist Philosophers: Women's Perspectives on Philosophical Traditions*, Brighton: Wheatsheaf Books.
- Grosz, Elizabeth and Elspeth Probyn (1995) *Sexy Bodies: The Strange Carnalities of Feminism*, London: Routledge.
- Haraway, Donna (1991) A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, in *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, New York: Routledge.
- H(ilda) D(oolittle) (1927, pub. 1981) *Her*, New York: New Direction Books.
- hooks, bell (1984) *Feminist Theory: From Margin to Center*, Boston, MA: South End Press.
- Irigaray, Luce (1974) *Speculum of the Other Woman*, trans. Gillian C. Gill. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Irigaray, Luce (1977) *This Sex Which is Not One*, trans. Catherine Porter, Ithaca, NY: Conell University Press.
- Figs, Eva (1974) *Days*, London: Faber and Faber.
- Jeffreys, Sheila (1994), *The Lesbian Heresy*, London: Women's Press.
- Kristeva, Julia (1974) *Revolution in Poetic Language*, New York: Columbia University Press.
- Kristeva, Julia (1977) *Desire in Language*, Oxfore: Basil Blackwell.
- Kristeva, Julia (1980) *The Power of Horror: An Essay on Abjection*, New York: Columbian University Press.
- Lloyd, Genevieve (1984) *The Man of Reason: 'Male' and 'Female' in Western Philosophy*, London: Methuen.

- Menchu, Rigoberta (1984) *I, Rigoberta Menchu: An Indian Woman in Guatemala*, London: Verso.
- Menchu, Rigoberta (1988) *Crossing Borders*, translated and edited by Ann Wright, New York: Verso.
- Milan Women's Bookstore Collective (1990) *Sexual Difference: A Theory of Socio-Symbolic Practice*, Bloomington: Indiana Press.
- Miller, Casey and Kate Swift (1980) *The Handbook of Non-sexist Writing for Writers, Editors and Speakers*, London: Women's Press.
- Millet, Kate (1969, repr. 1977) *Sexual Politics*, London: Virago.
- Mills, Jane (1989) *Womanwords*, London: Longman.
- MIT (2006) Women's Studies Program, *Interdisciplinary Programs*, http://web.mit.edu/catalogue/degre.human.inter.shtml#wome
- Modlesky, Tanja (1991) *Feminism without Women*, London: Routledge.
- Mohanty, Chandra Talapade (2003) *Feminism Without Borders Decolonizining Theory, Practicing Solidarity*, Durham and London: Duke University.
- Okley, Ann (1981), *Subject Women*, London: Martin Robinson.
- Olsen, Tillie (1980) *Silence*, London: Virago.
- Morgan, Robin (1984), *Sisterhood is Global*, Harmondsworth: Penguin.
- Parker, Rozsika and Griselda Pollock (eds.) (1981) *Old Mistress: Women, Art and Ideology*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Plath, Sylvia (1963), *The Bell Jar*, London: William Heinemann.
- Russ, Joanna (1975) *The Female Man*, New York: Bantam Books.
- Showalter, Elaine (1977, repr. 1978), *A Literature of Their Own*, London: Virago.
- Spender, Dale (1980) *Man Made Language*, London: Scarlet Press.
- Spivak, Gayatri Chakravorty (1988), *In Other Worlds: Essays in Cultural Politics*, London: Routledge.
- Stone, Allucquere Rosane (1996) *The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Rich, Adrienne (1973, repr. 1984), Diving into the Wreck, in A. Rich, *The Fact of the Doorframe*, New York: W. W. Norton, pp. 147-84.
- Walker, Alice (1982) *The Color Purple*, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Wallace, Michele (1990) *Black Macho and the Myth of Superwoman*, New York: Dial Press.
- Wittig, Monique (1969, repr. 1972) Les *Guérillères*, London: Picador.
- Wittig, Monique (1981), One is Not Born a Woman, in M. Wittig, *The Straight Mind and Other Essays*, London: Harvester Wheatsheaf, pp. 9-20.
- Wittig, Monique and Sande Zeig (1976, repr. 1980) *Lesbian Peoples: Materials for a Dictionary*, London: Virago.
- Wolf, Naomi (1991) *The Beauty Myth*, New York: William Morrow.
- Wolf, Naomi (1994) *Fire with Fire: The New Female Power and How It Will Challenge the 21st Century*, London: Vintage.
- Woolf, Virginia (1929, repr. 1983) *A Room of One's Own*, London: Granada.
- Woolmark, Jenny (1999) *Cybersexualities* (ed.), Edinburgh: Edinburgh University Press.